সেতুবন্ধ

স্টিফান জাইগ

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় * সেতুবন্ধ * স্টিফান জা

সেতুবন্ধ * স্টিফান জাইগ * অনুবাদ করেছেন

Stefan-Zweig-এর *FEAR*-এর অনুবাদ

সেতুবন্ধ

স্টিফান জাইগ



অনুবাদ
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘোষ ব্রাদার্স এণ্ড কোং। কলকাতা : ৬

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৬১
প্রকাশক
শ্রীভবেশ ঘোষ
ঘোষ ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলকাতা-৬
মুদ্রক
শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ
মা মঙ্গলচণ্ডী প্রেস
১৪বি শঙ্কর ঘোষ লেন
কলকাতা-৬
প্রচ্ছদ
সমীর সরকার
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
নিউ প্রাইমা প্রেস
কলকাতা
পরিবেশক
ক্যালকাটা বুক এজেন্সী
৭ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলকাতা-৬

দু' টাকা

শিল্পী মনীন্দ্র মিত্র
বন্ধুবরেষু

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অন্যান্য বই

। প্রবন্ধ ।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য

। গল্প ।

নতুন নায়িকা

রাম রহিম

রাত্রির আকাশে সূর্য্য

। অনুবাদ ।

প্রিয়তমেষু

সেই আশ্চর্য রাত

দুই ভাই

রাজসূয়

অন্তর্জ্বালা

শাদা কালো

গোধূলির গান

ইত্যাদি

প্রেমিকের ফ্ল্যাট থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল আইরিন। প্রতিবারের মত আজও দুর্বোধ্য একটা আতঙ্কে সে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ভালো করে চোখ মেলে চাইতে পারছে না। হাঁটু দুটো যেন ভেঙে আসছে—রেলিঙ ধরে কোনমতে পড়তে পড়তে সে সামলে নিল।

কত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আইরিন এই আতঙ্কের সঙ্গে! প্রায়-প্রত্যেকবার প্রেমিকের কাছ থেকে ফিরে যাবার সময় আতঙ্কটা তাকে ছেঁকে ধরে, অভিভূত করে ফেলে। অথচ, একেবারে যুক্তিহীন এই আতঙ্ক, একেবারেই অহেতুক!

অহেতুক, তবু মনে হয় বিপদের তার অবধি নেই। এই বুঝি ঘটে যায় ভয়ঙ্কর কিছু-একটা। প্রিয়মিলনের পর এ-ধরনের আতঙ্ক জাগা হাস্যকর বইকি। আইরিনও তা বোঝে। এবং আগে থেকেই নার্ভাস হয়ে পড়লে, তার একটা মানে হয়। কিন্তু কই—তা তো হয়নি!

ট্যাক্সিতে করে এসেছিল। রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর, কোনদিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এসে ঢুকেছিল প্রেমিকের ফ্ল্যাটে। পেয়েছিল নিশ্চিন্ত আশ্রয়। আসবার সময় যেটুকু উৎকণ্ঠা মনে জেগেছিল, প্রিয়তমের সাহচর্যে কখন তা মুছে গিয়েছে। কেটে গিয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, টেরও পায়নি। অক্ষয় সেই মদির মুহূর্তগুলি!

কিন্তু, বাড়ি ফিরে যাবার সময় হতেই—ওঃ ভগবান!—বাড়ি ফেরার কথা মনে হতেই দুর্বোধ্য একটা আতঙ্ক মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মন ছেয়ে যায় অপরাধবোধে। আইরিন দিশেহারা হয়ে পড়ে। মনে হয়, দূর-প্রসারিত পথটি যেন নির্বাক জিজ্ঞাসায় চেয়ে রয়েছে তার দিকে। যেন জানতে চাইছে, কি হয়েছে আইরিনের? কেন মুখখানি তার অমনভাবে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে?

প্রেমিকের সঙ্গে শেষ সময়টুকু ভালোভাবে সে কাটাতে পারে না। মন খুলে কথা কইতে পারে না, জবাব দিতে পারে না কথার। কেবলি মনে হয়—আসছে, বিদায়ের চরম মুহূর্ত ক্রমেই এগিয়ে আসছে! অস্বস্তিতে কেবলি ছটফট করে।

যখন বিদায় নেয়, থরথর করে কাঁপতে থাকে দেহমন। ভালোয় ভালোয় এখান থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচে এখন, অধৈর্য হয়ে পড়ে যাবার জন্যে। বিদায়বেলায় ও কি বলে, কোনদিন আইরিন শোনে না। ওর আদর-সোহাগে সাড়া দিতে পারে না। কতক্ষণে সে মুক্তি পাবে এই ফ্ল্যাট থেকে! কতক্ষণে ফিরে যেতে পারবে নিজের নিরাপদ গৃহকোণে, আপন সংসারে—ফিরে পাবে তার অতিপরিচিত পরিবেশ, মধ্যবিত্ত জীবনের মান-মর্যাদা! কতক্ষণে!

আইরিনকে ও প্রবোধ দেয়, মিষ্টিমধুর নানা কথা বলে—ওর কোন কথাই কিন্তু কানে আইরিনের যায় না। বুক তখন তার দুরদুর করছে, ফেটে পড়তে চাইছে চাপা উত্তেজনায়।

তার তখন শুধু এক তুশ্চিন্তা—গাড়িতে ওঠার সময় যদি কেউ দেখে ফেলে! তাহলে? বাইরে কেউ আড়ি পেতে নেই তো? সিঁড়ি দিয়ে কেউ কি উঠল, বা নেমে গেল? প্রেমিকের ঘরের ভেতরেও, প্রেমিকের বুকে মাথা রেখেও, আশঙ্কায় আইরিন উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

ঘরের বাইরেই যেন ওৎ পেতে থাকে আতঙ্ক। আইরিন বেরোবার সাথে সাথে সে তার পিছু নেয়। আইরিন হলঘরে আসতে আসতে সে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। দম বন্ধ হয়ে আসে আইরিনের। ধড়াস ধড়াস করে বুকখানি।

ঘর থেকে বেরিয়ে আইরিন আজ বারেক দাঁড়াল। অন্ধকার সিঁড়ির নিচে থেকে উঠে আসছে মৃতুমন্থর ঠাণ্ডা হাওয়া, বুক ভরে শ্বাস টেনে নিল।

ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল দরজা খোলার। শব্দটা শোনা মাত্র, নিজের অজান্তেই, তাড়াতাড়ি টুপিটা সে কপাল পর্যন্ত হেলিয়ে দিল, টেনে নামিয়ে দিল ওড়নাটি। তারপর পা বাড়াল যাবার জন্যে। জলে যেন আইরিন ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে, দাঁতে দাঁত চেপে আধ-খোলা দরজার দিকে ঝড়ের বেগে এগিয়ে গেল।

সদর দরজা পেরোবে, আচমকা ধাক্কা লেগে গেল একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে। 'আহা-হা! কিছু মনে করবেন না'—থতমত খেয়ে কোনমতে কথাগুলি উচ্চারণ করেই আইরিন সরে পড়ছিল, কিন্তু স্ত্রীলোকটি ততক্ষণে তুদিকে তুহাত ছড়িয়ে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

বিদ্রূপতিক্ত কর্কশ স্বরে সে বলে উঠল, 'এইবার ঠাকরুন! আজ একেবারে হাতেনাতে পাকড়াও করিছি! ঠিক ধরেছিনু! নিজের সোয়ামি-সন্সার নিয়ে সুখ হয় না, কেমন? তাই আমার মত গরীবগুর্বো মেয়েছেলের নোক নে টানাটানি! চুরি করে নুকিয়ে নুকিয়ে…'

'আ-আ-আপনি ভুল করছেন।' বলতে বলতে আইরিন পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু উপায় নেই যাবার, বোতলের মুখে ছিপির মত স্ত্রীলোকটি তার বিশাল শরীর দিয়ে আগলে রয়েছে দরজা।

'না গো ঠাকরুন—ভুল করছেন না!' সে মুখ ভেংচে উঠল। 'তোমায় আমি খু-ব চিনি। তোমায় চিনতে আমার বাকি নেই। এই মাত্তর এডওয়ার্ডের ঘর থেকে তুমি বেইরে আসছ। জানো, ও আমার পীরিতের মানুষ? আর তুমি কিনা ভুইলে-ভাইলে… এইবার তোমায় হাতেনাতে ধরে ফেলিছি।… তাই তো ভাবি, ইদানি ও আর আমার সাথে বেশি কেন রইতে চায় না। আসলে ভিত্‌রে ভিত্‌রে এই ব্যাপার…হতচ্ছাড়ি… ডাইনী'…

'দোহাই আপনার!' বাধা দিল আইরিন। জড়ানো স্বরে বলল, 'দোহাই আপনার, অমন করে চেঁচাবেন না।' বলে দু'পা পিছিয়ে গেল হলের দিকে।

স্ত্রীলোকটি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তীব্র চোখে। আইরিনের ভয়বিহ্বল চোখ-মুখ দেখে যেন যো পেয়ে গিয়েছে।

সুযোগ নিচ্ছে তার অকূল অসহায়তার। ফাঁদে-পড়া শিকারের দিকে তাকিয়ে আত্মসন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠেছে ওর চোখে, তিক্ত হাসিতে কুঁচকে এসেছে ঠোঁট দুটি।

গলা ঝেড়ে নিয়ে এবার সে আরও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'দেখে তো মনে হয় ভদ্দরঘরের বউ! আর তলে তলে কিনা এই! পরের নোক ভাগিয়ে নেয়া! আবার ঘোমটার বাহার কত! ঘোমটা দিলে তো কেউ চিনতে পারবে না— নিশ্চিন্তি! ইদিকে পরপুরুষের সাথে পীরিতও হবে, উদিকে ঘরসন্‌সারও বজায় রইবে। মানষের কাছে সতীগিরিও ফলানো—'

'কি চান আপনি?' ফের বাধা দিল আইরিন, 'আপনার সাথে আলাপের সৌভাগ্য আমার কখনো হয়নি। দয়া করে এখন পথ ছাড়ুন, আমি যাব।'

'যাব! হুম! তা এখন যেতে হবে বইকি, বড়নোক ভাতারের কাছে ফিরে না গেলে চলবে কেন বাছা! যাবে— নির্ঘস যাবে! নিজের ঘরসন্‌সারে ফিরে যাবে, গিয়ে গরম জলে চানধুতি করবে, ঝি এসে সাজগোজ কইরে দেবে—তা'পর সেজেগুজে পটের পরীটি হয়ে বড়নোক বন্ধুদের পথ চেয়ে বসে রইবে। ওরা এলে পর খাতির করে বসাবে, কত যত্নআত্তি··· আমার মত একটা মানুষ না খেয়ে খেয়ে মরে গেলে তোমার কিসসু আসে যায় না!···আমার শেষ সম্বলটুকুন চুরি করতে··· আমার মনের মানুষটাকে···'

ব্যাগের মধ্যে হাত পুরে দিয়ে আইরিন প্রায় সবগুলি নোট বার করে আনল একসাথে।

নোটগুলো স্ত্রীলোকটির হাতে গুঁজে দিয়ে ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলল, 'নাও···ধরো···স-ব নাও। এবার আমায় যেতে দাও। আর কক্ষনো আমি এখানে আসব না। প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোনদিন যদি'—

স্ত্রীলোকটি নোটগুলি নিল। আক্রোশে সে দাঁত কিড়মিড় করছে।

'হা-রা-ম-জাদী!' শুধু এই কথাটি বলে আইরিনকে পথ করে দিল যাবার।

কথাটা আইরিন শুনেও শুনল না। ঘাড় হেঁট করে এগিয়ে চলল, টেনে নিয়ে চলল নিজেকে। এসে পড়ল রাস্তায়। কেউ যেন তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে বাড়ির ছাদ থেকে।

ট্যাক্সির জন্যে সে মোড়ের দিকে হনহন করে এগোতে লাগল। আবছা-অস্পষ্ট মুখোশের মত মানুষের মুখগুলি দেখতে-না-দেখতে মিলিয়ে যাচ্ছে পথের দু'পাশে। শরীরটি তার ভারী হয়ে উঠেছে সীসার মত।

ট্যাক্সিতে উঠতেই দেহটা যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ল—স্প্রিংয়ের গদীর মধ্যে নিজেকে সে ডুবিয়ে দিল। মনটা একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছে, শুকিয়ে এসেছে ঠোঁট দুটি।

কোথায় যেতে হবে তার নির্দেশ না পেয়ে ড্রাইভার অবাক। খানিক অপেক্ষা করে সে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথাও যাব, ম্যাডাম?'

শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল আইরিন। মুহূর্তের জন্যে। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় শুধু বলল, 'ইস্টিশান।'

হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় স্ত্রীলোকটির কথা। যদি ও পিছু নিয়ে থাকে! যদি ট্যাক্সি পর্যন্ত ধাওয়া করে থাকে!

'জলদি! জলদি করো ড্রাইভার। যত জোরে পারো চালাও।' আতঙ্কে আইরিন অধৈর্য হয়ে উঠল।

গাড়িতে যেতে যেতে মন তার খানিকটা থিতিয়ে আসে। এখন বুঝছে, স্ত্রীলোকটির সাথে দেখা হয়ে যাওয়াতে ভেতরে ভেতরে কতখানি সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। মুষ্টিবদ্ধ দুই করতল, বরফের মত ঠাণ্ডা। এর অধিকারিণী যেন সে নয়, জড় দুটি পদার্থ যেন লেগে রয়েছে তার কবজির সঙ্গে।

হঠাৎ শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে হিমশীতল একটা শিরশিরানি ঝিলিক দিয়ে যায়, থরথরিয়ে ওঠে সর্বাঙ্গ। দম বন্ধ হয়ে আসছে, গলায় যেন কি-একটা আটকে গিয়েছে। আঠার মত জড়িয়ে আসছে জিব, তেতো-তেতো লাগছে। ভুরু দুটি কাঁপছে ভয়ানকভাবে। বড় অসুস্থ বোধ করে আইরিন।

ইচ্ছে করছে, গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, কিম্বা, প্রাণপণে ঘুঁষি ছুঁড়তে থাকে এলোপাথারি। তবে যদি উদ্ধার মেলে ভয়াল-ভয়ঙ্কর ওই স্মৃতির কবল থেকে।

কিন্তু, অসম্ভব! অসম্ভব ওর হাত থেকে মুক্তি। বঁড়শির মত ওই স্মৃতিটা যেন আঁকড়ে ধরেছে মস্তিষ্ককে। ওঃ। ওই কুৎসিৎ মুখখানার কথা ভাবলে এখনো গা রী রী করে ওঠে। কী স্থূল! কী কদর্য! মুখ থেকে ভক ভক করে পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ বেরুচ্ছে। আর, কী অশ্লীল কথাবার্তা! কী কর্কশ কণ্ঠস্বর! নিচু শ্রেণীর নগণ্য একটা মেয়েমানুষ—অশিক্ষিত অমার্জিত ছোটলোক এক স্ত্রীলোক—কিনা ভয় দেখাল তাকে! যা-নয়-তাই বলে গালাগাল দিল!

গা বমি-বমি করছে। বড় অসহায় বলে মনে হচ্ছে নিজেকে। শরীর এলিয়ে বসে রইল আইরিন। ড্রাইভার এ্যাক্সিলেটরে চাপ দিচ্ছে, ক্রমেই স্পীড বাড়ছে, গাড়িখানা দুলছে—সেই সঙ্গে দুলছে আইরিনের শরীর। দুলছে অসহায়ের মত।

একবার আইরিন ভাবল, ড্রাইভারকে বলে আরেকটু আস্তে চালাতে।—হঠাৎ মনে পড়ে গেল নগদ যা-কিছু ছিল সবই তো দিয়ে দিয়েছে ওই ব্ল্যাকমেলারকে। সর্বনাশ! ট্যাক্সির ভাড়া দেবে কোত্থেকে? তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে দেখল। দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল—যাক! ভাড়াটা কুলিয়ে যাবে কোনমতে।

কিন্তু, স্টেশন পর্যন্ত যাওয়ার মত সঙ্গতি নেই। ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলল। গাড়ি থামার সাথে সাথে সে নেমে পড়ল, নেমে চুকিয়ে দিল গাড়ির ভাড়া। ব্যাপারস্যাপার দেখে ড্রাইভার তাজ্জব।

হেঁটেই তাকে বাড়ি যেতে হবে, উপায় নেই।

এ-জায়গাটা তার অপরিচিত। দুপাশের দোকানগুলি অতি বাজে ধরনের। পথচারীরাও ঠিক ভদ্রশ্রেণীর নয়, কথাবার্তা শুনেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। এ-রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আইরিন অকথ্য অস্বস্তি বোধ করে। আতঙ্কের জের এখনো মেটেনি। এখনো হাঁটু দুটো ঠক ঠক করছে। বারবার ভেঙে পড়তে চাইছে। হেঁটে যাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠছে। তবু—তবু তাকে যেতেই হবে। যে-করে হোক নিজের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছতেই হবে।

জোর করে আইরিন সোজা করে রাখে নিজেকে। আস্তে আস্তে হেঁটে চলে, কোনমতে নিজের দেহটাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলে। যেন বরফের ওপর দিয়ে পথ করে করে চলেছে সে।

এ-রাস্তা ও-রাস্তা করে শেষ পর্যন্ত আইরিন বাড়িতে এসে পৌঁছল। পৌঁছেই হনহন করে ঢুকতে যাচ্ছিল, হঠাৎ খেয়াল হল—ভালো নয় এই অতি ব্যস্ততা। কেউ সন্দেহ করতে পারে।

হলঘরে আসতে দাসী এসে তার গায়ের কোট খুলে নিয়ে গেল। ওপর থেকে ভেসে আসছে ছেলের কলকণ্ঠ। বোনটির সাথে খেলা করছে। এই তার আপনার ঘর, এই তার আপন সংসার! কত পরিচিত এই পরিবেশ! এতক্ষণে আইরিন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এতক্ষণে সে নিরাপদ, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত। এবার চোখমুখ থেকে মুছে ফেলতে হবে ভয়ভীতির শেষ চিহ্নটুকুও। স্বাভাবিক হয়ে উঠতে হবে এবার।

ভুরু এবং চোখের ওপর আঙুল ঘষে ঘষে আতঙ্কের চিহ্নটাকে মুছে ফেলতে চাইল আইরিন। চোখেমুখে ভালো মানুষির ভাব ফুটিয়ে তুলে ঢুকল এসে খাবার ঘরে।

সন্ধ্যাহারের সময় হয়ে গিয়েছে। স্বামী বসে রয়েছেন। একমনে কাগজ পড়ছেন।

'ঈশ! তুমি আজ বড্ড দেরি করে ফেলেছ!' কোমল স্বরে তিরস্কার করলেন স্বামী। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর কপোলে এঁকে দিলেন স্নেহচুম্বন।

স্বামীর ব্যবহারে ফের আইরিনের মনে অপরাধবোধ জেগে ওঠে। সেটাকে গোপন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাড়াতাড়ি সে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। স্বামীও বসলেন তাঁর চেয়ারে। বসে ফের কাগজে মনোনিবেশ করলেন। মুখখানা তাঁর আড়াল পড়ে গেল।

'কিসে এত দেরি হল?' স্বামী জিজ্ঞেস করলেন, নিরাসক্ত ভাবে।

'আমি···গল্প···মানে এমিলির সাথে গল্প করতে করতে··· মানে···ওর আবার কেনাকাটার দরকার ছিল কিনা···তাই ওর সাথে দোকানে গিয়েই···'

এ-কি আহাম্মকের মত মিছে কথাগুলি বলছি আমি— আইরিন ক্ষেপে যায় নিজের ওপর।—বুদ্ধি করে আগে থেকে একটা-কিছু ভেবে রাখতে পারিনি? এমন জলজ্যান্ত মিছে কথা কি বিশ্বাস করতে পারে মানুষে

অন্যান্য দিন সে আগে থেকেই একটা যুক্তিসহ অজুহাত তৈরি করে রাখে। কিন্তু আজ হয়ে গিয়েছে মারাত্মক ভুল। আতঙ্কে এত-বেশি অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে এদিকের কথাটা ভাবতেও পারেনি।···ধরো, উনি যদি এখন···

'হ্যাগা মণি, কী হয়েছে তোমার বলো তো?' স্বামী জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন মুষড়ে পড়েছ মনে হচ্ছে···ওকি ওকি—টুপিটাকেই খাবে নাকি?'

খাবার কাঁটা দিয়ে আনমনে আইরিন টুপিটাকেই খুঁচিয়ে চলেছিল। তাড়াতাড়ি হুঁশিয়ার হয়ে উঠল। ফের ধরা পড়ে গিয়ে ভাবল—আর এখানে নয়। এক্ষুনি তার নিজের ঘরে চলে যাওয়া দরকার। গিয়ে নিজেকে আগে ভদ্রস্থ করে তোলা প্রয়োজন।

নিজের ঘরে চলে এল আইরিন। বিমূঢ় হয়ে গেল আয়নার দিকে তাকিয়ে—ওকি বিভ্রান্ত চাউনি ফুটে উঠেছে তার দুই চোখে! এক্ষুনি নিজেকে সামলে নিতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে আত্মকর্তৃত্ব।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আইরিন সামলে নিয়ে, ফিরে এল স্বামীর কাছে।

দাসী খাবার পরিবেশন করে গেল। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসে সবকিছু। শুরু হয় দৈনন্দিন পুনরাবৃত্তি। এই দম্পতির মধ্যে কথাবার্তায় উচ্ছ্বাসের মাত্রা এমনিতেই একটু কম। পরস্পরকে নিয়ে সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর মত হৈচৈ এরা

করে না। এ ওর সঙ্গে কথা বলে ভেবেচিন্তে—একটু-বা ইতস্তত করে।

অলস চিন্তার রোমন্থন করে চলেছে আইরিন। মনে মনে ভাবছে নানা কথা। নানা স্মৃতি এসে উঁকি দিচ্ছে মনে। চিন্তার সুতো ধরে এগোতে এগোতে আচমকা যদি মনে পড়ে যায় ভয়ঙ্কর ঐ ঘটনাটার কথা, অম্নি সে চোখ তুলে তাকায়—চারপাশে ছড়ানো তার অতিপরিচিত জিনিসপত্র। কত পরিচিত আর কী আপন এই পরিবেশ! এসব দেখে হৃদয়-মন শান্তি পায়, স্বস্তি পায়, বোধ করে পরম নিশ্চিন্ততা। এই সব জিনিসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কত-না মধুর স্মৃতি! তাই এ-সবের প্রতি মমতার তার অন্ত নেই। তাই এ-সবের দিকে তাকালে মন হয়ে আসে প্রশান্ত।

ঘড়িটা টিকটিক করছে হেলতে দুলতে, ঘরের স্তব্ধতা ভাঙছে। ওর ওই ছন্দোময় ধ্বনি আইরিনের বিধ্বস্ত স্নায়ুর ওপর যেন বুলিয়ে দিচ্ছে শান্তির প্রলেপ, সান্ত্বনা দিচ্ছে তাকে। জ্বরোরুগীর মত তার নাড়ির অস্বাভাবিক গতিকে ফিরিয়ে আনছে স্বাভাবিকতায়—ঘড়ির ওই ছন্দোময় টিকটিক ধ্বনি।

পরের দিন সকাল।

স্বামী অফিসে চলে গিয়েছেন, ছেলেমেয়েদের বেড়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—তাই আইরিন এখন কিছুক্ষণের জন্যে পেয়েছে নিরিবিলি অবসর। গতকালের ঘটনাটা একা একা বসে ভাববার সুযোগ এল এই প্রথম।

ভারী পাথরের মত ভয়ঙ্কর যে আতঙ্কটা কাল থেকে তার ওপর চেপে বসেছিল, শেষ পর্যন্ত আইরিন সেটাকে ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হল।

কি আছে অত ভয়ের ? ওড়না দিয়ে মুখখানি তার ঢাকা ছিল—অতএব তাকে ও চিনতে পারেনি। পারা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই এবার থেকে সাবধান হলেই চলবে। এখন সাবধান হওয়া কিছু শক্তও নয়। ভয়ের আর-কোন কারণই থাকবে না তাহলে।

আইরিন ঠিক করল, আর কখনো প্রেমিকের বাসায় গিয়ে তার সাথে দেখা করবে না। কালকের ব্যাপারটার পুনরুক্তির কোন আশঙ্কাই তাহলে থাকবে না।

আর, ওই 'মাগী'টার কথাই যদি ধরো—ওর পক্ষে ট্যাক্সি পর্যন্ত পিছু নেওয়া বা কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে বাড়ি পর্যন্ত এসে ধাওয়া করা—অসম্ভব। সেদিক থেকে কোন ভয় নেই। আপাতত সেজন্য মাথা না ঘামালেও চলবে।

না হয় ধরাই গেল, 'ওই ইয়েটা' যে-করে হোক তার নামধামের হদিশ পেয়ে গিয়েছে। পাক হদিশ, সেক্ষেত্রেও আত্মরক্ষার উপায় রয়েছে অনেকরকম।

একেবারে প্রত্যাসন্ন আতঙ্কের মুখোমুখি নয় বলে, আইরিন এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবতে পারছে। পারছে নিজের কর্মপন্থা ঠিক করে নিতে। কিসের পরোয়া করে সে? যে-অভিযোগই করা হোক, সরাসরি মুখের ওপর অস্বীকার করবে। স্রেফ অস্বীকার। তবু যদি ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায়—উল্টে ওই স্ত্রীলোকটাকেই তখন ব্ল্যাকমেলার বলে অভিযুক্ত করবে। ব্যস!

আইরিন তো আর যে-সে মানুষের বউ নয়, শহরের অন্যতম সেরা ব্যারিস্টারের গৃহিনী সে। এতদিন স্বামীর ঘর করে আইন-কানুন সে-ও এক-আধটু বোঝে বইকি! স্বামী যখন তাঁর সহকর্মীদের সাথে কথা বলেন, তখন সে চোখ-কান কিছু বুঝে থাকে না। ওঁদের কথাবার্তায় আইরিন জেনে গিয়েছে যে ব্ল্যাকমেলিং করা—লোককে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা—ভীষণ অপরাধ। আইনে এর জন্যে রয়েছে কঠোর সাজার বিধান।

সবচেয়ে আগে একটি কাজ করতে হবে: কয়েক দিনের জন্যে ওর সাথে দেখা করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না—এটা জানিয়ে দেওয়া দরকার। ছোট্ট একটা চিঠি লিখবে, যতদূর সম্ভব ছোট। কার্ল ব্রুস্টম্যানের পূর্বতন প্রেমিকা কিনা

ওই স্ত্রীলোকটা? ওই রকম অতিসাধারণ নগণ্য জঘন্য একটা মেয়েমানুষ! তার আগে কিনা ওই ছিল কার্লের প্রেয়সী! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! মানমর্যাদা আর রইল না। এটা জানার পর থেকে গ্লানিতে আইরিন মরে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে।

চিঠি লিখতে বসে আইরিন বেছে বেছে এমন সব শব্দ প্রয়োগ করতে লাগল যাতে করে তার মনের ভাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, স্পর্শকাতর একটি হৃদয়ে যাতে আঘাত লাগে প্রচণ্ড রকম। প্রকারান্তরে কার্লকে আইরিন জানিয়ে দিল—নেহাৎ খেয়ালের বশেই ওকে সে গ্রহণ করেছিল। ওর জন্যে কখনো কোনরকম আবেগ-অধীরতা সে বোধ করেনি। প্রেম-ট্রেম নয়—এ নিতান্তই শাদামাঠা একটা ব্যাপার।

ছেলেটি পেশাদার পিয়ানোবাদক। এক ইভনিং পার্টিতে তার সাথে আলাপ হয় আইরিনের। এবং, কি-হচ্ছে-না-হচ্ছে ভালো করে বোঝার আগেই আইরিন পরিণত হয়ে যায় তার মিস্ট্রেসে—অর্থাৎ, প্রায় উপপত্নীতে।

অথচ, আকৃষ্ট হবার মত বিশেষ-কিছুই ওর মধ্যে নেই। ওর জন্যে কখনো আইরিন বাসনাব্যাকুল হয়ে ওঠেনি। এমন-কি, দুজনের এই অন্তরঙ্গতার পেছনে আত্মিক কোন আকুতির প্রেরণাও উল্লেখযোগ্য হয়ে ধরা পড়েনি কখনো—কোনদিনও।

নিজের দিক থেকে কোনরকম যৌন তাগিদ বোধ না করেই নিজেকে আইরিন সঁপে দিয়েছিল। তবে, দেহগত সাধ তার

ছিল না সত্যি, সেই সঙ্গে ওর ইচ্ছেয় বাধা দেওয়ার সাধ্যও ছিল না।

অবশ্যি, কৌতূহল ছিল। তরুণ যুবক কি করে প্রেম করে, প্রেম করে কি করে—সেটা আবিষ্কারের কৌতূহল। কিন্তু, এই কৌতূহলও তেমন-কিছু জোরালো নয়।

বিবাহিত জীবনে আইরিন সুখী হয়েছে। দৈহিক, মানসিক বা আত্মিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে পরপুরুষের প্রয়োজন তার ছিল না। স্বামীই ছিলেন এজন্যে। এসব ব্যাপারে তিনি তাকে পুরোপুরি তৃপ্ত করেছিলেন।

এছাড়া রয়েছে তার দেবশিশুর মত দুটি ছেলেমেয়ে। স্বামী আর সন্তান নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পরম সুখে সে দিন কাটাচ্ছিল।

কিন্তু সহজে যা পাওয়া যায় অনেক সময় সেটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অতি সুখে দেখা দেয় মনের অসুখ। জীবন হয়ে যায় বড় একঘেয়ে, অস্বস্তিকর। অতিতৃপ্তি ক্ষুধার মতই ক্ষতিকর পাকস্থলীর পক্ষে।

আইরিনের বেলাতেও তাই ঘটল। নিরাপত্তা বন্দীত্ব বলে মনে হল তার কাছে। তাই সে উদগ্রীব হয়ে উঠল না-জানা রোমাঞ্চের আশায়।

এমতাবস্থায় ওই তরুণ পিয়ানোবাদক যখন স্বীকার করে নিল তার নারীত্বের পৃথক সত্তা, এবং সেই হিশেবে তার মনোরঞ্জনের জন্যে উঠে পড়ে লাগল—ধরা না দিয়ে তখন উপায়

আইরিনের রইল না। চেনাপরিচিত পুরুষদের কাছ থেকে একঘেয়ে স্তাবকতা আর প্রাণহীন শ্রদ্ধার প্রশস্তি শুনে শুনে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সব ওলোটপালোট করে দিল পিয়ানো-বাদক। মন আইরিনের আনচান করে উঠল। আস্বাদ পেল বহু-আকাঙ্ক্ষিত না-জানা রোমাঞ্চের।

কৈশোর পেরোবার পর থেকে এমন-কোন ঘটনা জীবনে তার ঘটেনি, হৃদয়মনে যাতে প্রবল আবেগের আলোড়ন অনুভব করতে পারে। এবার ঘটল ব্যতিক্রম।

সঙ্গীতশিল্পীর যে-জিনিসটা তাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল তা হল ওর বিষণ্ণতা। বিষণ্ণতার মূর্তিমান প্রতীক যেন। চারপাশে ঘিরে রয়েছে অভিজাত সমাজের সুখী-সন্তুষ্ট নরনারীরা, চটকদার সাজপোশাক, চেহারাতেও জৌলুষের অন্ত নেই--এদেরই মাঝখানে বসে ও তন্ময় হয়ে পিয়ানো বাজাচ্ছিল। কী বিষণ্ণ-কোমল মুখখানি! একেবারে বেমানান এই পরিবেশে!

দেখেই অবজ্ঞা জাগে। আর, অবজ্ঞা জাগাই তো স্বাভাবিক। তবু, কেন-যে মন আইরিনের স্বাভাবিকতার গণ্ডি পেরিয়ে গেল! গভীরভাবে সে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল শিল্পীকে—মাথা হেঁট করে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে। দেখলেই মনটা কেমন টনটন করে ওঠে। অপলক আইরিন তাকিয়ে রইল।

বাজনার শেষে জানাল উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন। বেছে বেছে এমন-সব বিশেষণ ব্যবহার করল, শুনে হকচকিয়ে গেল শিল্পী।

কী-বোর্ড থেকে মাথা তুলে তাকাল বারেক—সরাসরি তার মুখের দিকে। চোখাচোখি হল।

প্রথমবার চোখাচোখি হতেই বুক গুরগুর করে উঠল আইরিনের। আতঙ্ক বোধ করল হঠাৎ।

শুধুই আতঙ্ক ? না, আনন্দও মেশান রয়েছে এই আতঙ্কের সঙ্গে।

দুচারটে কথার বিনময় হল। বলতে গেলে, নেহাৎই অর্থহীন অবান্তর সেসব কথা। কিন্তু, অর্থহীন অবান্তর ওই কথাগুলিই দুটি নরনারীর হৃদয়ের গভীরে গিয়ে ঘা দিল।

আইরিন যেন মন্ত্রমুগ্ধ। দুর্বার হয়ে উঠল শিল্পীর সম্পর্কে কৌতূহল। শেষ পর্যন্ত নিজে থেকেই যেচে বলল, এরপর যেখানে ক্রস্টম্যান বাজাবে দয়া করে যেন একবার জানায় তাকে। আইরিন শুনতে যাবে।

তারপর ? তারপর আর কি—প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হতে লাগল। দৈবক্রমে অবশ্যই নয়।

কয়েক সপ্তাহ পরে। ক্রস্টম্যান একদিন জানাল—নতুন একটি সঙ্গীত সে রচনা করেছে। আইরিনকে শোনাতে চায়। সকলের আগে আইরিনকে !

প্রস্তাব শুনে গর্বে-গৌরবে উপছে উঠল আইরিন। সত্যিকারের একজন শিল্পী, সর্বজনপরিচিত বিখ্যাত এক শিল্পী কিনা তার নতুন সৃষ্টির পরীক্ষক হিশেবে বেছে নিয়েছে তাকে ? এ যে অচিন্ত্যনীয় অবিশ্বাস্য ব্যাপার !

এক কথায় আইরিন রাজি হয়ে গেল ক্রস্টম্যানের ফ্ল্যাটে যেতে।

হতে পারে, এর পেছনে কারোই কোন কুমতলব ছিল না। খোলা মনেই ফ্ল্যাটে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ক্রস্টম্যান, কিছু না ভেবেই তার ফ্ল্যাটে যেতে রাজি হয়েছিল আইরিন। ব্যাপারটা ঘটে গেল কিন্তু অন্যরকম।

শুধু চুম্বনেই এর পরিসমাপ্তি হল না, ক্রস্টম্যানের দাবির কাছে হার মেনে নিল আইরিন। স্বেচ্ছায়।

কিন্তু পরে, বোধশক্তি ফিরে আসার সাথে সাথে, সে হয়ে গেল বিস্ময়বিমূঢ়! এ কি করে বসল! এ কী সর্বনাশ করল! হঠাৎ এ কি মতিচ্ছন্ন হল তার! এ কী ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গেল!

বিয়ের শপথ ভাঙার ইচ্ছে তার মোটে ছিল না। ওকথা সে ভাবতেও পারে না।

নিজেকে আইরিনের বড় অপরাধী মনে হতে লাগল।

তবু—অপরাধী মনে হওয়া সত্বেও—মনে মনে এখন সে গর্ব বোধ করছে। স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে—আইরিন তাই মনে করে—স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে সে ছিঁড়ে ফেলেছে তথাকথিত আভিজাত্যের নিগড়। যে-শুষ্ক নীতিবোধ আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে বেঁধে রেখেছিল, সাহস ভরে সেটাকে সে অস্বীকার করেছে। হবে না গর্ব! জীবনে এ তার এক অভিনব অভিজ্ঞতা। কুমতি তাকে আরো উস্কে দিল।

রোমাঞ্চকর এই আবেগটা কিন্তু স্থায়ী হয় না বেশীক্ষণ। খানিক পরে স্বভাবতই ওর সম্পর্কে মনে বিরূপতা দেখা দেয়। বিশেষ করে, ওর পিয়ানো বাজনার ওপর। পিয়ানোই তো যত নষ্টের মূল। ওই বাজনা শুনেই না সে মজেছিল।

ক্রস্টম্যান সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে যেমন পিয়ানো বাজায়, তেমনি প্রেমের বেলাতেই এগিয়ে যায় বেপরোয়া হয়ে। প্রিয়তমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দুর্বার বাসনার জোয়ারে। দুদিকেই সে শক্তিমান পুরুষ। সবেতেই তার বাড়াবাড়ি।

তার এই বাড়াবাড়িতে আইরিন অস্বস্তি বোধ করে। আপনা থেকেই স্বামীর সঙ্গে তুলনা করে বসে কার্লে'র। স্বামী কত সংযত, কত সুবিবেচক! এতদিন তো বিয়ে হয়েছে, এখনো তবু তাঁর লজ্জা ভাঙল না। স্ত্রীর সম্মতি না থাকলে নিজের খুশিমত তিনি আজো কিছু করেন না।

তবু, একবার যখন স্বামীর কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হয়েছে, তখন আর পিছন ফিরে লাভ কি! অন্যায় যা করবার তা তো করেই ফেলেছে, অসম্ভব এখন এর প্রতিবিধান। প্রেমিকের দিকেই ঢলে পড়ল আইরিন। সংস্কারের বাধাটা সরে যাওয়ার সাথে সাথে পথ হয়ে গেছে সহজ-সরল।

অবৈধ এই মেলামেশায় সে যে খুব আনন্দ পায়, তা নয়। এ নিয়ে মনে তার কোনরকম মোহের সঞ্চারও হয় নি।

কেনই বা আনন্দ পাবে? মোহের সঞ্চারই বা হবে কেন? নিছক উপপত্নীর কর্তব্য সে পালন করে যায়—অবৈধ প্রেমিকের

প্রতি উপপত্নীর যে কর্তব্য। সেই সঙ্গে রয়েছে কেমন-যেন ক্লান্তি একটা। এতে বাধা দেবার উৎসাহটুকু পর্যন্ত নেই তার—দেহ মন দু-ই ক্লান্ত, অবসন্ন। ধীরে ধীরে এটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠল। পরিণত হল অভ্যাসে।

কাটল এইভাবে মাসখানেক। তরুণ শিল্পীর ছোঁয়ায় তার জীবনের ধারা গেল বদলে। কার্লের সাথে নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ করা আর-পাঁচটা কাজেরই অনিবার্য একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। প্রতি সপ্তাহে যেমন একবার করে শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে দেখা করে আসে, বা আত্মীয়স্বজন কি বন্ধুবান্ধবের বাড়ি যায়—এও যেন তেমনি। এর জন্যে তার দৈনন্দিন জীবনের কোন ব্যতিক্রম ঘটল না, আগের মতই চলতে লাগল সবকিছু। শুধু বাড়তি একটা কাজ বাড়ল—এই যা।

এমন কী অপ্রত্যাশিত আনন্দ কার্ল তাকে দিয়েছিল? কিছুই না। নতুন একটি সন্তান হলে বা আরেকটা গাড়ি কিনলে যে আনন্দ সে পেত, তার চেয়ে বেশি কিছু কার্ল তাকে দিতে পারে নি। দিন কয়েকের মধ্যেই এই নতুন রোমাঞ্চের স্বাদ হয়ে গেল পান্‌শে। অবৈধ প্রেমের আকর্ষণ সমাজস্বীকৃত দাম্পত্য সুখশান্তিকে ছাপিয়ে যেতে পারল না।

বিপদের প্রথম সংকেতেই আইরিন আজ বুঝতে পারছে—কী ভয়ঙ্কর পরিণাম অবৈধ প্রেমের। ভাগ্য এতদিন, বলতে নেই, তার প্রতি সদয় ব্যবহারই করে এসেছে। ছেলেবেলা থেকে আদরে-সোহাগে মানুষ হয়েছে। অতিরিক্ত আদর দিয়ে

দিয়ে বাপ-মাই তার মাথা খেয়েছেন—একেবারে আহ্লাদী করে তুলেছেন। প্রাচুর্যের সংসারে যখন যা চেয়েছে, পেয়েছে। কখনো কোন ব্যাপারে হতাশ হতে হয় নি।

এর ফলে মনটা তার হয়ে পড়েছে বড়ই স্পর্শকাতর। এবং একগুঁয়ে, জেদী, আবদারে। মৃদুমন্দ হাওয়াতেই উদ্দাম হয়ে ওঠে মনের পাথার—ঝড়ের আভাষ বলে তাকে মনে করে আইরিন। প্রেমিকের জন্যে ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিন্দুমাত্র বিসর্জন দেওয়ার কথাও সে তাই ভাবতে পারে না।.........

সেদিন বিকেলেই কার্ল-এর কাছ থেকে চিঠি এল। সে কী চিঠি! চিঠির ছত্রে ছত্রে উত্তেজনা ফুটে বেরোচ্ছে—কত অনুনয় জানিয়েছে! ভর্ৎসনা করেছে নানাভাবে। এসব কী মাথামুণ্ডু লিখেছে আইরিন!

চিঠি পড়ে আবার সব গোলমাল হয়ে যায়। ব্যাপারটার এখানেই ইতি করে দেবে কিনা আইরিন বুঝে উঠতে পারে না। তার সম্পর্কে ও সরাসরি যেমন অনর্গল উচ্ছ্বাস জানিয়েছে, সেটা স্তাবকতারই নামান্তর। গর্ব সেজন্যে হচ্ছে, সত্যি। ওর হতাশার এমন বেপরোয়া প্রকাশ দেখে মনটাও যেন কেমন-কেমন করছে। কী-যে এখন কর্তব্য তার!

অনেক কাকুতি-মিনতি করে কার্ল লিখেছে—দয়া করে আর একবার অন্তত তার সাথে আইরিন দেখা করুক, তাহলেই সে বুঝতে পারবে কি ব্যাপার, কি বৃত্তান্ত। কেন আইরিন হঠাৎ তার

প্রতি বিমুখ হল ? না জেনে সে-ই যদি কোন অপরাধ করে থাকে, হাতে ধরে মাপ চেয়ে নেবে। শুধু একবার আইরিন দেখা করুক—আর একবার শুধু !

আইরিন যেন নতুন একটা খেলা পেয়ে গেল। নিজের মনের কথা জানতে দেবে না, থাকুক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে। এর ফলে ওর কাছে তার দাম বেড়ে যাবে অনেক গুণ।

এই ভেবে দিনক্ষণ স্থির করে একটা চায়ের দোকানে দেখা করবার জন্যে ওকে লিখে দিল। অনেক দিন আগে, তখন তার বালিকা বয়েস, ওই চায়ের দোকানেই আইরিন দেখা করেছিল এক অভিনেতার সঙ্গে। অভিনেতাটি সম্পর্কে মনে তার ক্ষণিক মোহের সঞ্চার হয়েছিল—অনেক দিন আগে। প্রথম কৈশোরের সেই উৎসাহ-উত্তেজনার কথা আজ কত তুচ্ছ, কী অকিঞ্চিৎকর বলেই না মনে হয় ! তারপর বিয়ে হয়ে গেল। এতদিন বিবাহিত জীবন কাটাল। আজ স্বামী রয়েছেন, তা ছাড়াও এক প্রেমিক সে জুটিয়েছে—সেদিনের কথা আজ স্বপ্ন বলে মনে হয়।

'সত্যি, কী আশ্চর্য মানুষের জীবন !' আপন মনে স্বপ্নাচ্ছন্ন সুরে কথা কইতে লাগল আইরিন। 'জীবনে আবার রোমান্স এল ! আমার জীবনে !'

শুধু, 'ওই ইয়েটা'র কথা কাঁটার মত মনে বিঁধছে। নইলে আইরিন এখন খুশি বইকি। প্রবল আবেগের মত এমন রোমাঞ্চকর ঘটনার আস্বাদ অনেকদিন সে অনুভব করে নি। ধীরে ধীরে মন তার শান্ত হয়ে আসে, শরীরটা ঝরঝরে হয়ে ওঠে।

আইরিন ঠিক করল—এবার দেখা করতে যাবে কালো রঙের গাউন পরে, অন্য-একটা টুপি মাথায় দিয়ে। তাহলে দৈবাৎ যদি 'ইয়েটা'র মুখোমুখি পড়েও যায়, ভয়ের কারণ থাকবে না— 'ইয়েটা' কিছুতেই তাকে চিনতে পারবেনা। সেই সঙ্গে মুখ ঢাকবার জন্যে ওড়নাও নিচ্ছিল, কিন্তু পরতে গিয়ে মন বেঁকে বসল—ওড়না নেবে কেন? তার মত সম্ভ্রান্ত, সম্মানভাজন এক মহিলা ওড়নায় মুখ ঢেকে পথে বেরোবে? মুখ তুলে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে চলার সাহসটুকুও তার থাকবে না? কেন সে মিছে ভয় পাচ্ছে? ওড়নাটা ড্রয়ারে গুঁজে রেখে দিল আইরিন।

ভয়ের তার কারণ নেই কোন।

কিন্তু, বাড়ির নিরাপদ গণ্ডি পেরিয়ে পা বাড়ান মাত্র ভয়ে এসে তার বুক চেপে ধরল। সাঁতারু যেন বরফশীতল জলে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি সবে ছুঁইয়েছে—শির শির করে উঠল সর্বশরীর।

এ-আতঙ্ক অবিশ্যি নেহাৎই ক্ষণিক। পরমুহূর্তই মন পুলকিত হয়ে ওঠে। আর যাই হোক, আনন্দের রোমাঞ্চ রয়েছে এই অভিসারে। সহজ ভাবে হাঁটতে লাগল আইরিন, বুক ফুলিয়ে হেঁটে চলল সাহসিকার মত।

আফসোস শুধু এই, চায়ের দোকানটা বাড়ির বড় কাছে। একবার পথে নামলে আর-কিছুর তোয়াক্কা সে রাখে না।

নিজের পদধ্বনিই চলার প্রেরণা যোগায়, চুম্বকের মত টেনে নিয়ে চলে—অনেক দূর-দূর পথ আইরিন তখন পাড়ি দিতে পারে অনায়াসে।

যাক, এখন ওসব ভেবে দরকার নেই। দেখা করার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে। ও নিশ্চয় হা-পিত্যেশ করে রয়েছে। কি ভাবছে কে জানে!

কার্ল বসে ছিল দোকানের এক নির্জন কোণে। থেকে থেকে খালি তাকাচ্ছিল দরজার দিকে।

ছটফট করছিল অধীরতায়।

আইরিনকে ঢুকতে দেখেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

তার এই অধীরতা ভালো লাগল আইরিনের। ভালো লাগল, সেই সাথে বিতৃষ্ণাও জাগল কিছুটা। কেননা যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে সেটা ভুলে গেলে চলবে না। সংযত হয়ে কথা বলবার জন্যে, আবোলতাবোল না বকবার জন্যে এক্ষুনি ওকে সাবধান করে দিতে হবে।

ওর সঙ্গে কেন সে দেখা করতে চায় না—স্পষ্ট করে সেকথা আইরিন বলল না। এটা-ওটা নানা কথায়, আভাষে-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিতে চাইল কারণটা। তার ফলে, মুষড়ে পড়া দূরে থাক, কার্ল হয়ে উঠল আরো উদ্দীপ্ত। প্রিয়তমার মান ভাঙাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল।

কাঠ হয়ে বসে রইল আইরিন। কার্লের প্রেমালাপে একটুও সাড়া দিল না। সাড়া না দিলেও সে কিন্তু ভালো ভাবেই

বুঝছে যে ফল এতে কিছু হবে না। হঠাৎ এভাবে এবং বাহ্যত অকারণে মেলামেশা বন্ধ করে দিলে দমে যাওয়ার বদলে শিল্পী হয়ে উঠবে আরো-বেশি উদ্দাম।

আধঘণ্টাটাক জোর কথা কাটাকাটি করে কার্লের কাছ থেকে সে বিদায় নিল। কার্ল সোহাগ জানাতে এসেছিল, আইরিন তাকে ছুঁতে পর্যন্ত দিল না। কার্লের হাজার মিনতিতেও ভবিষ্যৎ দেখাসাক্ষাৎ সম্পর্কে একটি কথাও বলল না।

বাড়ি ফিরে এল খুশি মনে—এতখানি খুশি কৈশোর পেরোবার পর কোনোদিন সে হয় নি। মনে হচ্ছে, তার সত্তার গভীরে যেন জ্বলে উঠেছে আনন্দের একটি ক্ষীণ শিখা। এই ক্ষীণ শিখাটিকে সর্বগ্রাসী আগুণে পরিণত করার জন্যে প্রয়োজন এখন ঝড়ো হাওয়ার।

রাস্তার লোকজন মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখছে। ভালো লাগছে আইরিনের। পুরুষের সপ্রশংস দৃষ্টি সম্পর্কে এতখানি সচেতন সে কোনদিন ছিল না। আইরিন অভিভূত হয়ে পড়ে। কী এত ওরা দেখছে তার দিকে চেয়ে! সত্যিই কি সে এত সুন্দর?

একটা ফুলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে আইরিন, দাঁড়াতে বাধ্য হয়। দোকানের আয়নার দিকে তাকায়, মুগ্ধ চোখে দেখতে থাকে নিজের মুখখানি।

থরে থরে সাজানো লাল গোলাপ আর শিশির-ভেজা ভায়োলেটের মাঝখানে কী অপরূপ যে ছাখাচ্ছে মুখখানি তার!

আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তিতে হৃদয় আইরিনের ভরে যায় কানায় কানায়।—কী অপূর্ব সুন্দর আমি!

পাখির মত হালকা লাগছে দেহটি। কৈশোর পেরিয়ে এসে এমন শিশুয়ালী আনন্দ, এতখানি ইন্দ্রিয়সক্তি আর কখনো সে অনুভব করে নি। বিয়ের প্রথম দিকেও না, প্রেমিকের বাহুবন্ধনেও নয়। আনন্দের বন্যায় আইরিন যেন ভেসে চলেছে, দেহের প্রতিটি অনুপরমাণু তার জ্বলে উঠেছে কী-এক পরশমণির ছোঁয়া পেয়ে। এ-আনন্দের আস্বাদ স্বামী বা প্রেমিক কারো কাছ থেকেই সে পায় নি এতকাল।

মদিরমধুর এই উত্তেজনাকে বৃথা যেতে দেওয়া যায় না—আইরিন ভাবল। আবার সেই দৈনন্দিন জীবনের ঘেরাটোপে ফিরে যেতে হবে—ভাবতেও গা ঘিন ঘিন করে ওঠে।

কিন্তু, যেতে তবু হবেই। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে! বড় পরিশ্রান্ত! কোন মতে নিজেকে আইরিন বাড়ির দিকে টেনে চলল।

দরজায় পৌঁছে দাঁড়াল বারেক। শেষবারের মত উপভোগ করে নিতে চায় নতুন-পাওয়া এই অভিজ্ঞতার সৌরভটুকু। মাথা হেলিয়ে দিল পিছন দিকে, বুক ভরে শ্বাস টেনে নিল।

হঠাৎ জামার আস্তিনে টান পড়তেই আইরিন সচেতন হয়ে ওঠে, আচমকা এক ধাক্কায় যেন জেগে ওঠে স্বপ্নের ঘোর থেকে।

'কে?' চকিতে সে ঘুরে দাঁড়াল, 'অ্যাঁ! কি—আবার কী চাও তুমি? ফের তুমি আমায় জ্বালাতে এসেছ!' ক্ষেপে গেল

আইরিন। সে—সেই ঘৃণ্য স্ত্রীলোকটা! বাড়ি পর্যন্ত এসে ধাওয়া করেছে!

কথাগুলো বলে ফেলেই কিন্তু ঠোঁট কামড়ে ধরল। কী সর্বনাশ! এ কি করল! স্বেচ্ছায় ধরা দিল! আইরিন কী প্রতিজ্ঞা করে নি যে ফের 'ওই ইয়েটা' এসে হামলা করলে ওকে সে আচ্ছা শিক্ষা দিয়ে দেবে? জন্মের মত ভেঙে দেবে ওর বিষদাঁত?

এখন আর উপায় নেই। সে-ই ওর ফাঁদে পড়ে গিয়েছে। সাধ করে নিজেই ডেকে এনেছে নিজের সর্বনাশ—মুহূর্ত্তের ভুলে, ক্ষণিক উত্তেজনার বশে। জীবনভোর ভুগতে হবে এর জন্যে।

'আপনার তরে কখন থেকে দাঁইড়ে আছি, ফ্রাউ ভাগনার। তা ঘণ্টাটাক তো'—

হায়! হায়! হায়! আইরিনের নামধামও জেনে গিয়েছে! কি করে জানল? কে জানাল? গেল! সব এবার গেল! সর্বনাশ হল!

'হ্যাঁ, তা ঘণ্টাটাক তো বটেই!' মুখ বেঁকিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বলল স্ত্রীলোকটি।

'কী চাও?'

'সে তো আপনি বুঝতেই পারছ···মুখ ফুটে আপনাকে আর কি বলব, ফ্রাউ ভাগনার, আমি যে কিসের তরে এসিছি—'

'কিন্তু—তারপর থেকে ওর সাথে আমি···আর আমি ওর সাথে তো দেখা করিনি। তোমাকেই তো বলেইছিলুম যে আর ওর সাথে আমি দেখা করবো না—আর কক্ষনো···'

'শুধুসুধু কেন মিছে কথাগুনো বলছ গা ? চায়ের দোকান তক তোমার পিছু পিছু আমি গিয়েছিনু, বুঝতাল্লে,···তা মরুক গে যাক···দেখ বাপু, চাকরিবাকরি নেই আমার, ছাঁটাই হয়ে গিইছি। মালিক বললে, ব্যাবসাপত্তরের অবস্তা বড় খারাপ ··· আর একটা জোটাতেও পারছিনি। অবিশ্যি তোমার মতন ভদ্দরনোক মেয়েছেলে হলে কি চাকরির তোয়াক্কা করতুন—হেথাহোথা ঘুরেফিরে হেসেখেলে মজাসে······'

কথার স্বরে ঝরে পড়ছে তিক্ত জ্বালা আর অকথ্য ঈর্ষা। দম যেন আইরিনের বন্ধ হয়ে আসে। স্ত্রীলোকটির নির্লজ্জ কুৎসিৎ বেহায়াপনার কাছে সে বোবা হয়ে যায়।

মুখ ফুটে আইরিন একটি কথারও প্রতিবাদ করতে পারল না। পরিণত হল ওর অনায়াস শিকারে।

আর, সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল অপরিসীম আতঙ্ক। অবিকল আগেকার মত।

ধরো, ও যদি আরও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলতে শুরু করে—তাহলে তো নির্ঘাৎ ঝি-চাকরদের কানে যাবে? কিম্বা, স্বামীই যদি এখন এসে পড়েন ?···

ভাববার অবসর নেই, তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলল আইরিন। হাতের মুঠোয় যা পেল সব বার করে এনে গুঁজে দিল স্ত্রীলোকটির কড়াপড়া হাতে।

কিন্তু টাকা পেয়েও করতলের হাঁ-টা বুজে যাওয়া দূরে থাক, তেমনি প্রসারিত হয়ে রইল—হিংস্র পশুর লোলুপ থাবার মত।

'ব্যাগটাও দিয়ে দাও ঠাকরুন, খুচরোগুলোই বা বাদ যায় কেন।' মুখ বেঁকিয়ে বলল স্ত্রীলোকটি। হেসে উঠল খিক খিক করে।

মুখোমুখি তাকাল আইরিন। মনটা ঘৃণায় রী রী করছে। রাগে জ্বলে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। উপায় নেই! তবু কিছু করবার উপায় নেই। যে করেই হোক মুক্তি এর হাত থেকে পেতেই হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিটিয়ে ফেলতে হবে অতীতের জের।

চোখ ঘোঁচ করে চেয়ে আছে 'ইয়েটা,' পাছে ওর সাথে ফের চোখাচোখি হয়ে যায়—আইরিন পাশ ফিরল। ফিরে দামী হাতব্যাগটা ছুঁড়ে দিল ওর তামাটে থাবায়। তারপর এক মুহূর্তও আর দাঁড়াল না। সশব্দে দরজা বন্ধ করেই উর্ধ্বশ্বাসে উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে।

হের ভাগনার এখনো বাড়ি ফেরেন নি।

যাক, খানিকটা সময় অবসর পাওয়া যাবে। অবসর পাওয়া যাবে নিজেকে সামলে নেবার। বিছানায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আইরিন।

পড়ে রইল স্তব্ধ হয়ে। মরা মানুষের মত অচঞ্চল।

কিন্তু কতক্ষণই বা! হলঘরে স্বামীর গলার স্বর শোনামাত্র স্প্রিংয়ের মত উঠে দাঁড়ায়। টুকটুক করে যন্ত্রচালিতের মত গিয়ে ঢোকে খাবার ঘরে। তার সমস্ত প্রাণশক্তি যেন নিংড়ে বার করে নেওয়া হয়েছে।

এরপর থেকে ওই স্ত্রীলোকটা আইরিনের সর্বসময়ের সাথী হয়ে দাঁড়াল। চব্বিশ ঘণ্টা তার উপস্থিতি আইরিন মর্মে মর্মে অনুভব করে। আইরিন এঘর থেকে ওঘরে গেলেও সে যেন তার পিছু নেয়।

সময় কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। এ'কদিনে আইরিন সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া ভালো করে ভেবে দেখবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে। ভেবেওছে।

'ওই ইয়েটা' কি করে তার নামধাম জানতে পারল? আইরিন ভেবে পায় নি। তবে এটুকু বুঝেছে—যে-করেই পারুক, ওর কবল থেকে রেহাই নেই। একবার যখন প্রশ্রয় পেয়েছে, কিছুতেই আর ছাড়বে না। বছরের পর বছর এই দুর্বহ বোঝার, এই দুঃসহ দুর্ভাগ্যের জের টেনে তাকে চলতে হবে। এর থেকে মুক্তির কোন পথ আইরিন খুঁজে পাচ্ছে না।

নিজের তার কিছু সম্পত্তি রয়েছে সত্যি, এবং বলতে নেই, স্বামীও রোজগার ভালোই করেন—তবু স্বামীকে না জানিয়ে কতকাল 'ইয়েটার' দাবি সে মেটাতে পারবে? দিনকে দিন ওর দাবির বহর তো বেড়েই চলেছে।

এতকাল ব্যারিস্টার স্বামীর ঘর করে এটা সে ভালোভাবেই বুঝে নিয়েছে যে এ-ধরনের লোকদের—ব্ল্যাকমেলারদের—বিশ্বাস নেই কোনমতে। ওরা যা চাইবে তা-ই যদি দিয়ে

দাও তবু ভবিষ্যতে ফের এসে ওরা হানা দিতে পারে। হয়ত মাসখানেক, কি মাসদুই বড়জোর শান্তিতে কাটাল—তারপর হঠাৎ একদিন দেখবে ফের শুরু হয়ে গেছে পুরনো খেলা নতুন করে।

আর, যদি তুমি রুখে দাঁড়াও, যদি ওর কাছে নতি স্বীকার না করো—দুর্নাম ও কলঙ্কের দুরপনেয় কালি লাগবে তোমার গায়ে। শুধু তোমার নয়, তোমার সংসারের নামে পর্যন্ত বদনাম রটবে। ঢি ঢি পড়ে যাবে সর্বত্র।

তার চেয়ে, এভাবে সপরিবারে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়ে—ব্ল্যাকমেলারের মন যুগিয়ে চলাও শ্রেয়।

আচ্ছা, কী হতে পারে শেষ পর্যন্ত?

দিনরাত আইরিনের এই এক দুশ্চিন্তা।

সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়—একদিন স্বামীর নামে এল একটা উড়ো চিঠি। স্বামী পড়লেন, পড়তে পড়তে ভুরু দুটো তাঁর জুড়ে গেল, মুখখানা হয়ে গেল ছাইয়ের মত। তারপর···

তারপর তিনি হয়ত এসে শক্ত মুঠোয় তার কব্জিটা চেপে ধরবেন, জিজ্ঞেস করবেন······

জিজ্ঞেস করবেন···কিন্তু—তারপর? তারপর কি করবেন তিনি? কী করবেন তা-র-প-র?

আর আইরিন ভাবতে পারেনা। চোখের সামনে আঁধার ঘনিয়ে আসে। আতঙ্ক—অমানুষিক অপরিসীম আতঙ্কে সে অভিভূত হয়ে যায়।

ভাবতে ভাবতে একটা সত্য আইরিন আবিষ্কার করল—এতদিন স্বামীর ঘর করছে, অথচ তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কিছুই সে জানেনা। উনি যে কোন ধরনের মানুষ আজো আইরিন বুঝে উঠতে পারে নি। এমন একটা ব্যাপার যদি ঘটেই যায় তাহলে কী করবেন উনি—ঘুণাক্ষরেও সে আন্দাজ করতে পারছে না।

তুপক্ষের বাপ-মারা মিলে এই বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিয়েতে কোনরকম বাধা আইরিন দেয়নি। বিনা দ্বিধায় একে মেনে নিয়েছিল। আট বছরের দাম্পত্য জীবনে ক্ষণিকের তরেও সেজন্যে আফসোস জাগেনি। বড় সুখে ও স্বচ্ছন্দে এই কটি বছর কেটে গিয়েছে। তুটি সন্তানের মা হয়েছে, সংসারটি নিজের মনের মত করে গড়ে তুলেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছে স্বামীর সঙ্গে, উপভোগ করেছে দেহমিলনের স্বর্গীয় পুলক।

তবু, আজও সে ওঁর মনের হদিশ জানেনা। অনেক ব্যাপারে স্বামীর মনোভাব আজো সে আন্দাজ করতেও পারেনা।

আজ প্রথম আইরিন স্বামীর মন-মেজাজ বিশ্লেষণের প্রয়াস পেল। তাঁর চরিত্রের প্রধান প্রধান দিকগুলি পরীক্ষা করে দেখতে চাইল। ছোটখাট আপাততুচ্ছ ঘটনা দিয়েই মানুষকে চেনা যায়—সেই সব ঘটনাগুলি এখন একে একে মনে আনবার চেষ্টা করল। ভাবতে লাগল তন্ময় হয়ে।

যত ভাবে, তত বেশি জাগে আতঙ্ক।……

স্বামী বসে বসে বই পড়ছেন। ইলেকট্রিকের আলোয় মুখখানি তাঁর আলোকিত হয়ে উঠেছে। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আইরিনের মনে হয়—উনি যেন স্বামী নন তার, অজানা এক আগন্তুক।

চোখমুখে পৌরুষের কী দীপ্তি! পড়ছেন একমনে—মানসিক ক্রিয়ার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে প্রশস্ত কপালে, ঘন ভুরুতে। চাপা ঠোঁট, সুগঠিত চোয়াল—দেখেই মনে হয় অতিরিক্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কখনো কারো কাছে মাথা হেঁট করেন না।

শক্তসমর্থ চেহারা, শক্তিমান পুরুষ—তবু, কত সুন্দর!

আইরিন অবাক হয়ে যায়।

সাধ জাগছে ওঁর চোখে চোখে চাইতে, কিন্তু চোখ দুটি যে অবনত বইয়ের পাতায়।

অথচ চোখের দিকে তাকালেই মানুষটার পরিপূর্ণ পরিচয় সে পেয়ে যেত—কোন সন্দেহ তার নেই।

একদৃষ্টে আইরিন তাকিয়ে রইল স্বামীর মুখের দিকে—পাশ থেকে মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে। এই প্রথম স্বামীর দিকে তাকিয়ে অপার বিস্ময় জেগে উঠেছে মনে তার।···আইরিনের অধঃপতনের কথা শুনলে উনি কি শুধু একবার ধমক দিয়েই ছেড়ে দেবেন? শুধু সাবধান করে দেবেন ভবিষ্যতের জন্যে?··· নাকি, জন্মের মত তাকে পরিত্যাগ করবেন?···চেয়ারে বসে রয়েছে এক অপরিচিত আগন্তুক। ওঁর মুখের দিকে তাকালে শরীর শিউরে ওঠে। অথচ, মুখখানা কী সুন্দর! কত মনোহর!

বিয়ের এতগুলি বছর পরে আজ প্রথম আইরিন এটা লক্ষ্য করল।···শুধু ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেই আনন্দে মন ভরে যায়—এ-আনন্দের সাথে মেশানো রয়েছে গর্ব। গর্বে বুক উপছে ওঠে।···সাধ যায় চিরকাল এইভাবে তাকিয়ে থাকতে।···

হঠাৎ স্বামী চোখ তুললেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সরে গেল আইরিন। অন্ধকারে গিয়ে আত্মগোপন করল।

তার নিজের চোখে ফুটে উঠেছে যে দুরন্ত জিজ্ঞাসা পাছে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে তার সাথে—আইরিন তাই পালিয়ে গেল।

তিনদিন আইরিন বাড়ি থেকে বের হল না।

তার এই হঠাৎ অভ্যাস পরিবর্তনে ঝি-চাকররা অবাক হয়ে যায়। ছেলেমেয়ে পর্যন্ত, বিশেষ করে ছেলেটি। মা-মণি কেন আর আজকাল বেড়াতে বেরোন না? ছেলেটি তো একদিন সরাসরি প্রশ্নই করে বসে। গভর্নেসও উশখুশ করে। সুযোগ পেলেই এর-ওর কাছে কথাটা তোলে—ব্যাপার কি? হল কি বাড়ির গিন্নির?

এদিকে আইরিন প্রাণপণে চেষ্টা করে স্বাভাবিক থাকবার। সব সময় মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখে—অস্বাভাবিক যেন কিছুই ঘটেনি জীবনে তার। সাধারণত সে ঘর-গেরস্থালীর খুঁটিনাটি নিয়ে ঘামায় না, এখন সংসারের নানা কাজেও হাত দিতে যায়। তার ফলে হয় হিতে বিপরীত। ভণ্ডুল করে ফেলে কাজকর্ম। পরিস্থিতি হয়ে ওঠে আরও ঘোরালো।

পড়াশোনা বা সেলাই নিয়ে ভুলে থাকবে, তারও যো নেই। চাপা আতঙ্কে কেবলি ছট্‌ফট্ করে। স্থির হয়ে বসতে পারে না দু'দণ্ড। সদরে ঘন্টাধ্বনি হলেই আঁৎকে ওঠে। টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শুনলেই ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুক। দম বন্ধ হয়ে আসে আতঙ্কে।

জীবন আইরিনের দুর্বিষহ হয়ে উঠল।

ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর ছবি ফুটে ওঠে চোখের সামনে—এর

থেকে পরিত্রাণের পথ নেই। কোন উপায় নেই উদ্ধারের! দুঃখে, ক্ষোভে, হতাশায় সে একেবারে ভেঙে পড়ে। তিনদিন মাত্র বাড়ি থেকে বেরোয় নি, অথচ মনে হয়—কতকাল ধরে যেন বন্দিনী হয়ে রয়েছে। আট বছরের দাম্পত্য-জীবনের চেয়েও এই বন্দিত্বের মেয়াদ যেন অনেক ; অনেক গুণ বেশি।

তৃতীয় সন্ধ্যায় হঠাৎ মনে পড়ল, একজনের সাথে না তার দেখা করার কথা ছিল কদিন আগেই? অথচ···না, এভাবে দিন চলতে পারে না। যদি বাঁচতে হয়, ফের যদি মাথা উঁচু করে চলতে হয়—আতঙ্কের বশীভূত হলে চলবে না। এই আতঙ্ক দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ধরেছে, পিষে ফেলতে চাইছে—ধূলিসাৎ একে করতেই হবে। মানুষের সাহচর্য তার চাই। ঘণ্টাকয়েকের জন্যে অন্তত এই দুঃসহ একাকীত্বের হাত থেকে, আতঙ্কের এই হিংস্র কবল থেকে মুক্তি তাকে পেতেই হবে। নইলে সহজ-স্বাভাবিক মানুষ সে কখনোই হয়ে উঠতে পারবে না।

তাছাড়া, এই ঘর, এই বাড়ি, পরিচিত এই পরিবেশ প্রতিমুহূর্তে তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই কথা। কিছুক্ষণের জন্যে তাই এর থেকে দূরে সরে যেতে হবে। বন্ধুবান্ধবের সাহচর্যই তো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই সময়।

রাস্তায় পা দেবে, হঠাৎ বুকটা দুরদুর করে ওঠে। আতঙ্ক! সেই আতঙ্কটা যেন তার হিমশীতল হাত দিয়ে মুঠো করে ধরেছে

আইরিনের হৃৎপিণ্ড—'ইয়েটা' কোথাও ঘাপটি মেরে নেই তো? শক্ত মুঠোয় স্বামীর হাতটা সে জড়িয়ে ধরল। পা বাড়াল চোখ বুজে। এগোল পুতুলের মত। কোনমতে গিয়ে উঠে বসল গাড়িতে।

হু হু করে গাড়ি চলেছে এবার নিজেকে সামলে নেয় আইরিন। গাড়ির গতিবেগে আতঙ্কটা ধীরে ধীরে উবে যায়।

বন্ধুর বাড়ি পৌঁছে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল—যাক! আর ভয় নেই। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত।

ঘণ্টা দুই তিনের জন্যে আইরিন একেবারে মানুষ হয়ে গেল। খুশিতে উচ্ছ্বসিত। হাস্যময়ী লাস্যময়ী চিরন্তন তরুণী। সদ্য বন্দিদশা থেকে মুক্তির আনন্দে কিছুটা-বা বেশি চপল।

শত্রু এখানে তার নাগাল পাবে না। ভয় এসে এখানে হানা দিতে পারবে না। চারপাশে যারা রয়েছে এরা তাকে ভালোবাসে, তাকে শ্রদ্ধা করে। অভিজাত সমাজের নরনারী এরা—এদের চোখেমুখে সাজপোশাকে খুশির রোশনাই। কোনরকম দুর্ভাবনার বালাই নেই। হেসেখেলে এরা জীবন কাটায় অবাধ আনন্দে। সেই অবাধ আনন্দের স্রোতে এরা আইরিনকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল, ভুলিয়ে দিল তার মানসিক যাতনা।

আনন্দে আইরিন বাঁধনহারা। স্বামীর হাত ধরে যখন এখানে এসে ঢোকে, সকলের চোখে ফুটে উঠেছিল বিমুগ্ধ বিস্ময়! তাই দেখেই সে বুঝে গিয়েছিল—আজ তাকে দ্যাখাচ্ছে অপরূপ।

সঙ্গে সঙ্গে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিল। তাকে সুন্দরতর করে তুলেছে সেই চেতনা।

পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে যন্ত্রসঙ্গীতের সুরঝঙ্কার। সুরের ঝঙ্কার ঝঙ্কৃত হচ্ছে দেহের প্রতিটি অনুপরমানু, উদ্দাম হয়ে উঠেছে রক্তস্রোত। সবাই নাচছে। আইরিনও নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। নিজের অজান্তে সে-ও নাচতে শুরু করে দেয় ছন্দের তালে তালে—নৃত্যপরা নরনারীদের সাথে মিশে যায় একাকার হয়ে। দেহমনে আর কণামাত্র গ্লানি নেই। শরীরটি যেন তার সুসম ছন্দে পরিণত।

হঠাৎ থেমে গেল সঙ্গীতঝঙ্কার, হঠাৎ নেমে এল স্তব্ধতা। আইরিনের আত্মাকে পাষাণের মত চেপে ধরল এই স্তব্ধতা। এই বিরতি অবশ্য নেহাৎই সাময়িক। আবার শুরু হল যন্ত্রসঙ্গীত। বিস্মৃতির শীতল প্রলেপ বুলিয়ে দিল আইরিনের অশান্ত মনে। নৃত্যসঙ্গী তাকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে চলেছে ছন্দোময় ভিড়ের মধ্যে দিয়ে—ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে আইরিনের অস্বস্তি, ধীরে ধীরে ফিরে আসছে আগেকার সেই খুশিয়ালী ভাবটা।

ভালো নাচিয়ে আইরিন নয়। প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে হিশেব করে ভেবেচিন্তে ফেলতে হয়, হুঁশিয়ার থাকতে হয় প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু, সদ্য-পাওয়া স্বাধীনতার আনন্দে এখন সে দিশেহারা, কিসের প্রেরণায় যেন উদ্দীপ্ত। আনন্দে বেপরোয়া হয়ে আইরিন নাচতে লাগল। রক্তে রক্তে জেগে উঠল কী এক

মর্মরধ্বনি—যে-হাতটি তাকে বেষ্টন করে ধরেছে, যে-হাত দুটি তাকে ছুঁয়ে রয়েছে, যে-প্রসন্ন হাসি তার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে, যে-সুরলহরী কানে এসে বাজছে—তার সবার মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলেছে রক্তের ওই মর্মর, একতারে যেন বাঁধা হয়ে গিয়েছে। আনন্দের আতিশয্যে দেহটি যেন মিশিয়ে যেতে চাইছে হাওয়ায়। পরনের গাউনটাকে পর্যন্ত অস্বস্তিকর বলে মনে হয়। ইচ্ছে করে, খুলে ফেলে, ছুঁড়ে ফেলে সব আবরণ। নিরাবরণ হয়ে সমস্ত দেহ দিয়ে আকণ্ঠ পান করে নেয় আনন্দের এই নেশা-ঝিমঝিম নির্যাস। একেবারে নিরাবরণ হয়ে—ভগবানের কাছ থেকে এসেছিল যেরকম হয়ে!

'আইরিন! ওগো শুনছ, হল কী তোমার?'

চকিতে আইরিন ঘুরে দাঁড়াল। উত্তেজনায় ঝিকঝিক করছে তার চোখের তারা, শরীর টলছে। তাকাল স্বামীর চোখাচোখি। ও কি! অমন করে কী দেখছেন উনি? তবে কি সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে? মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে? আর তার ফলে নিজেই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেছে নিজের সঙ্গে?

'আমি···আমি ঠিক বুঝতে···ঠিক বুঝতে পারছিনে, ফ্রিজ।' আইরিন আমতা আমতা করে। আবার সেই আতঙ্ক তাকে ছেঁকে ধরেছে।

স্থির দৃষ্টিতে স্বামী তাকিয়ে রয়েছেন। ওই দৃষ্টির উত্তাপে সমস্ত অন্তরাত্মা যেন শুকিয়ে যায়। আইরিনের মুখ কাগজের মত শাদা হয়ে গেল।

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে!' একটু থেমে স্বামী বিড় বিড় করে বললে।

স্বরে সস্নেহ অনুযোগের সুর। তাহলে ঠাট্টা করছেন! কিন্তু, এরকম ঠাট্টা কেন করলেন? ইচ্ছা হলেও মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারে না আইরিন। সাহস হয় না জিজ্ঞেস করবার।

আর কিছু না বলে স্বামী অন্যদিকে চলে গেলেন। আইরিন তাকিয়ে রইল, তাকিয়ে তাকিয়ে স্বামীকে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে তাঁর পৌরুষদীপ্ত স্বাস্থ্য আর বৃষস্কন্ধের ওপর চোখ পড়তেই হঠাৎ থরথর করে উঠল সর্বশরীর। আচমকা মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে গেল: 'খুনী! অবিকল খুনীর মত দেখতে!'···নিজের ওপর আর কোন কর্তৃত্ব নেই তার। তার স্বামী—তার নিজের স্বামী···কী ভয়ঙ্কর···কী ভয়ঙ্কর ওঁর চেহারা···কী ভীষণ ওঁর···

ফের শুরু হল যন্ত্রসঙ্গীত। সামনে এগিয়ে এল একজন, নৃত্যসঙ্গী হিশেবে তাকে গ্রহণ করল আইরিন। গ্রহণ করল যন্ত্রের মত। তাকিয়েও একবার মানুষটাকে দেখল না। দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না। পা দুটি এখন সীসের মত ভারী হয়ে উঠেছে। সঙ্গীতের সুরলহরী মনে আর সাড়া জাগাতে পারছে না। প্রতিটি পদক্ষেপে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠছে হৃদয়, ভেঙে পড়ছে খান খান হয়ে

শেষ পর্যন্ত আইরিন আর সইতে পারে না।

নৃত্যসঙ্গীর কাছ থেকে মাপ চেয়ে বিদায় নিল। তার

বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে করতে তাকাল আড়চোখে—হ্যাঁ, যা ভেবেছে! ওই তো! ওই তো উনি দাঁড়িয়ে! দাঁড়িয়ে যেন তারই প্রতীক্ষা করছেন—কখন এসে আইরিন দাড়াবে তার পাশে।

তারই প্রতীক্ষায় রয়েছেন, অথচ চোখের দৃষ্টিতে সেই এক চ্যালেঞ্জের ভাষা। কী চান উনি? কী ভেবেছেন উনি তার সম্পর্কে? কী ভাবছেন?···তবে কি—তবে কি উনি কিছু সন্দেহ······?

পোষাক-আশাক ঠিক করে নিল আইরিন। গুটিগুটি এসে দাঁড়াল স্বামীর পাশটিতে। নির্নিমেষ ওই চাউনির সামনে স্থির হয়ে থাকা অসম্ভব।

'বাড়ি যাবে?' ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

'চলো।'

কী কর্কশ স্বর! এতটুকু দরদের ছোঁয়া নেই!

স্বামী চললেন আগে আগে, তাঁর পায়ে পায়ে আইরিন—ভীত সন্ত্রস্ত সচকিত। আবার ওই পৌরুষদীপ্ত স্বাস্থ্য আর বৃষস্কন্ধ সম্পর্কে সে সচেতন হয়ে উঠেছে। আবার সেই আতঙ্ক এসে মনে হানা দিয়েছে।

দ্রুতবেগে গাড়ি চলেছে। কথা নেই কারো মুখে। কিন্তু, আতঙ্কে আইরিন অধীর হয়ে উঠেছে। সহস্র বাহু মেলে বিপদ এগিয়ে আসছে চারপাশ ঘিরে, সন্দেহ নেই—এ সম্পর্কে মনে আইরিনের কোন সন্দেহ নেই আর!

সে-রাতে আইরিন ভয়ানক খারাপ একটা স্বপ্ন দেখল ঃ

কোথা থেকে ভেসে আসছে আশ্চর্য সুরঝঙ্কার। বড় মতন একটি আলোকোজ্জ্বল ঘর। আইরিন ভেতরে ঢুকল। নানা ধরনের নানা বয়সের বিচিত্রবেশ বহু নরনারীর ভিড়। এগিয়ে এল একটি ছেলে। সামনে এসে দাঁড়াল।···দেখে ভীষণ চেনা-চেনা লাগছে, অথচ কোথায় দেখেছে, কি করেই বা চিনল কিছুতেই মনে করতে পারছে না। ছেলেটি তাকে একহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। তারপর দুজনে নাচল। মন আইরিনের খুসিতে উচ্ছ্বসিত। সুরের ছোঁয়ায় পা দুটি এত হাল্কা হয়ে গিয়েছে যে মনে হয় মসৃণ মেঝের ওপর টুক টুক করে লাফাচ্ছে সে ছোট্ট একটি পাখির মত। হাওয়ায় যেন ভেসে বেড়ায় দুজনে।···নাচতে নাচতে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যায়, ও-ঘর থেকে পরের ঘরে। আলোঝলমল প্রতিটি ঘর। উঁচু ছাদ থেকে ঝুলছে শোভন সুন্দর সোনালীরঙ ঝাড়লণ্ঠন। ছাদ নয়—নক্ষত্রখচিত আকাশ যেন।······হাসছে আইরিন। চারপাশের আয়নায় আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে সেই হাসি ফিরে আসে তারই কাছে—ফের ফিরে যায় আয়নায়। চিরন্তন যেন এই হাসি। ক্রমেই জোরালো হয়ে ওঠে নাচের ছন্দ, বাজনার তাল দ্রুত থেকে দ্রুততর—দ্রুততম।···ছেলেটি এবার আরো কাছে ঘেঁষে আসছে—বুঝছে আইরিন—আরো, আ-রো

কাছে ঘেঁষে এল, আ-রো জোরে তাকে জড়িয়ে ধরল।···তার উলঙ্গ বাহুটির ওপর হাত বুলোচ্ছে। আদর করছে। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সোহাগ জানাচ্ছে। সোহাগের এই উষ্ণমধুর মদির ছোঁয়ায় গা শিরশির করে ওঠে, বেরিয়ে আসে গভীর একটা নিশ্বাস—আনন্দের আতিশয্যে।···চোখে চোখে তাকাল। এবার আইরিন চিনতে পেরেছে—এ সেই অভিনেতা, কিশোরের সেই স্বপ্নের দেবতা। একদিন দূর থেকে একে পূজো করত। আর এখন !···নামটা উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ও তার দুই ঠোঁট চেপে ধরল রোমাঞ্চক চুম্বনে। বাহুতে বাহুতে বাঁধা দুজনে, আবার ভেসে চলে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে, ও-ঘর থেকে পরের ঘরে—হাওয়ায় ভাসা শুকনো ঝরাপাতার মত।···চারপাশ থেকে চার দেওয়াল যেন সরে সরে যায়, দিগন্তে হারায়।···মাথার ওপরে ছাদটিও নেই। ছাদ উঠে গিয়েছে আকাশে।···ধূ ধূ প্রান্তরের—তেপান্তরের—অবাধ মুক্তি নেমে এসেছে। থেমে গিয়েছে সময়ের হৃদ্‌স্পন্দন।··আনন্দ ! আনন্দ !···এত আনন্দ যেন সওয়া যায় না ! এত আনন্দের বোঝা বওয়া যায় না ! মাটির এই পৃথিবীর সাথে নেই তার আর কোন সম্পর্ক।···স্বপ্ন ! স্বপ্ন ! স্বপ্নের মত মনে হয় সবকিছু। স্বপ্নের মত অবাস্তব, স্বপ্নের মত অপার্থিব—অলৌকিক।···হঠাৎ কে যেন তার কাঁধে টোকা দিল। আইরিন চমকে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল সুরঝঙ্কার। দপ করে নিভে গেল আলোর দেয়ালি। অন্ধকার ! চারপাশে অন্ধকার দেয়ালের বন্দিশালা।

কোথায় সেই নৃত্যপরা নরনারীরা? নেই! কেউ কোথাও নেই। চোখের পলকে সব উবে গিয়েছে।…'ফিরিয়ে দে! তুই চোর! তুই চোর! ওরে আমার মনের মানুষকে ফিরিয়ে দে।' তীক্ষ্ণ স্বরে গর্জে উঠল এক নারীকণ্ঠ। সেই স্ত্রীলোকটি! বরফের মত ঠাণ্ডা হাত দিয়ে তার কবজিটা মুঠো করে ধরেছে।… 'ফিরিয়ে দে! ফিরিয়ে দে! আমার মনের মানুষকে তুই ফিরিয়ে দে। চোর! তুই চোর!'…প্রাণপণে আইরিন নিজেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করে। বৃথা চেষ্টা।…দুটি নারীর মধ্যে শুরু হয়ে যায় হাতাহাতি। কিন্তু, তার চেয়েও শক্তিশালিনী 'ওই ইয়েটা'। এক হেঁচকায় তার গলা থেকে সে মুক্তোর মালাটি ছিনিয়ে নিল। চড়চড় করে ছিঁড়ে ফেলল তার অমন সুন্দর গাউনটি—অর্ধোলঙ্গ করে ছেড়ে দিল।…এই সময়, হঠাৎ, হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে লোকজন এসে ঢুকতে লাগল, চারপাশ থেকে, বন্যার বেগে।…মুহূর্তের মধ্যে লোকে লোকারণ্য। হাজার হাজার চোখ তাকিয়ে তার দিকে, তাকিয়ে বাঁকা চোখে, মুখ কুঁচকিয়ে। আর, এক নাগাড়ে চিৎকার করে চলেছে স্ত্রীলোকটি—'ওগো, শোন, তোমরা সবাই শোন—আমার মনের মানুষকে এ ছিনিয়ে নিয়েছে! এই বেবুশ্যে মাগীটা—এই হারামজাদী চুরি করেছে আমার মনের মানুষকে!'…লুকোবার এতটুকু জায়গা নেই। কোনদিকে তাকাবার সাধ্য নেই। চারপাশ থেকে কাঁটার মত উঁচিয়ে রয়েছে হাজার হাজার চোখ। উদগ্র কৌতূহলে ফেটে পড়তে চাইছে, যেন ছুঁয়ে দেখতে চাইছে

তার উলঙ্গ দেহটিকে।···দিশেহারা আইরিন, সাহায্যের জন্যে ব্যাকুলভাবে এপাশ-ওপাশ তাকাল, আঁতিপাতি করে খুঁজতে লাগল—এতটুকু যদি মেলে আশ্রয়। হঠাৎ চোখ পড়ে যায় দরজার দিকে—আলোছায়ার আঁধারীতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন··· স্বামী! ছবির মত অবিচল। ছবির মত অপলক। পিছনে ডান হাত। আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল সে, এঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু, কোথায় পালাবে? পালিয়ে যাবে কোথায়? জনতাও ছুটল পিছন পিছন। বারবার সে ঘর বদল করে—জনতা নাছোড়বান্দা। তাড়া করে চলে পায়ে পায়ে। উন্মাদিনীর মত ছুটছে আইরিন। খশে খশে পড়ছে সাজ-পোষাক। সমস্ত আবরণ। শুধু দু'একটি ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে সে কোনমতে লজ্জা নিবারণ করছে। ছুটছে। সেই অবস্থাতেই। ছুটতে ছুটতে সামনে পড়ল বন্ধ একটা দরজা—প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজা খুলে ফেলল—সিঁড়ি। হুড়মুড় করে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।···যাক, এবার সে নিরাপদ। কিন্তু···কিন্তু ওই তো সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে সে—সেই কুৎসিৎ স্ত্রীলোকটা। পরনে সেই নোংরা পোষাক। সেই কড়াপড়া তামাটে হাত। দেখেই অন্যদিকে ছুটতে শুরু করল—তাড়া-খাওয়া ভীত হরিণীর মত—ছুটে চলল।···আইরিন ছুটছে, ও-ও ছুটছে পিছনে পিছনে। এ-রাস্তা থেকে ও-রাস্তায়, ও-রাস্তা থেকে সে-রাস্তায়। এই রাস্তারও যেন শেষ নেই, শেষ নেই এই ছোটারও। দু'পাশের আলোগুলি যেন মিট মিট করে

হাসছে, হাসছে তাকে দেখে। পিছনে শোনা যাচ্ছে স্ত্রীলোকটির সস্তা দামের জুতোর থপ থপ শব্দ—পিছনে। তবু, সামনের দিকে তাকালেই যেন ওর দেখতে পায় হিংস্র মুখখানা। দু'পাশের প্রতিটি বাড়ির আনাচে কানাচে যেন ওৎ পেতে রয়েছে ওই স্ত্রীলোকটা— একাই একশ হয়ে ছড়িয়ে সর্বত্র। চারপাশ থেকে তাকে তাড়া করছে। তাড়া করে নিয়ে চলেছে। যতক্ষণ না হাঁটু ভেঙে পড়ে, মুখ থুবড়ে সে পড়ে যায়—তাড়া করে নিয়ে চলবে। ··ছুটতে ছুটতে আইরিন বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল দরজার ওপর। সশব্দে খুলে গেল দরজা, সে ঢুকে গেল ভেতরে। সামনে দাঁড়িয়ে স্বামী! হাতে ছুরি। আগুন দুই চোখে। তাকালেন স্ত্রীর দিকে। 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?' জিজ্ঞেস করলেন নিষ্প্রাণ স্বরে। 'কোথাও না।' নিজের স্বর নিজের কানেই অচেনা হয়েই বাজে, আর সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে তীক্ষ্ণ তীব্র অট্টহাসি। 'আমি দেখেছি। ওই মাগীটাকে আমি দেখে ফেলেছি। হাঃ হাঃ হাঃ।' স্বামী হাত তুললেন, ঝিলিক দিয়ে উঠল ছুরির শাণিত ফলা। 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

আর্তস্বরে আইরিন চেঁচিয়ে উঠল, 'কে কোথাও আছো বাঁচাও—বাঁচাও!'

ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল আইরিন। চোখ কচলিয়ে সামনের দিকে তাকাল—স্বামী! একদৃষ্টে তাকিয়ে তারই দিকে। ঘরে আলো জ্বলছে।

সে তাহলে বাড়িতেই রয়েছে! এ সবই তাহলে স্বপ্ন!

স্বপ্ন! যাক—

কিন্তু—

কিন্তু স্বামী তার বিছানার একপাশে বসে কেন? সে কি অসুস্থ যে অমন করে তাকিয়ে রয়েছেন তার দিকে? আলোই বা জ্বালল কে? উনি? কেন উনি কথা বলছেন না? কেন পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গিয়েছেন? কেন? কেন?

আতঙ্কে গা শিরশির করে ওঠে। মুখ তোলবার সাহস হয় না, সন্তর্পণে হাতের দিকে তাকাল আইরিন, আড়চোখে। না, হাতে ছুরি নেই!

আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে ঘুমের কুয়াশা, ফিরে আসছে স্বাভাবিক বোধশক্তি। স্বপ্ন!

এতক্ষণ ধরে যা যা দেখেছে, সব স্বপ্ন, স্বপ্ন দেখেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, সাহায্যের জন্যে আর্তনাদ করে উঠেছিল। তার আর্তনাদেই স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাই উনি ছুটে এসেছেন।

কিন্তু, অমন করে তাকিয়ে তাকিয়ে তার মুখে উনি কী দেখছেন? কী উনি বলতে চান?

আইরিন হাসবার চেষ্টা করল।

'কি গো, অমন মুখ গোমড়া করে তাকিয়ে আছ কেন? জানো, ভারী বিচ্ছিরি একটা দুঃস্বপ্ন দেখে—'

'ঘুমের ঘোরে তুমি কাঁদছিলে। পাশের ঘর থেকে শুনে আমি—'

কাঁদছিলাম ? সর্বনাশ ! বেফাঁস কিছু বলে ফেলিনি তো ? উনি কি কিছু শুনেছেন ? শুনলে, কী শুনেছেন ?—চকিতে ভাবনাগুলো আইরিনের মাথায় খেলে যায়। স্বামীর চোখে চোখে তাকাতে সে ভরসা পায় না।

স্বামী অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। তেমনি নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলেন স্ত্রীর দিকে।

একটু পরে বললেন, 'তোমার কি হয়েছে বল তো, রিনা ? বুঝতে পারছি, কিছু-একটা ঘটেছে—হুঁ, নিশ্চয়। গত তিনচার দিন ধরে তুমি যেন কেমনতর হয়ে গেছ। মনে হয়, ভেতরে ভেতরে জ্বরজারি হয়েছে—সব সময় তাই উত্তেজিত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে থাক। সব সময় ছটফট করছ—ঘুমের ঘোরেও···?'

ফের হেসে ব্যাপারটা আইরিন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল।

'না না, হাসি নয়।' স্বামী বলতে লাগলেন, 'আমার কাছ থেকে কিছু লুকিও না, লক্ষ্মিটি ! মন খারাপ হয়েছে, হ্যাঁ, সোনা ? কেউ তোমায় ব্যথা দিয়েছে ? বলো ? তুমি যে সত্যিই বদলে গিয়েছ বাড়ির সব্‌বাই সেটা লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্মিটি, বল না গো—কি হয়েছে তোমার ? আমায় তুমি বিশ্বাস করো না ? ওগো—'

স্বামী আরো কাছে ঘেঁষে এলেন।

আইরিন অনুভব করে, তার নগ্ন বাহুতে স্বামীর সোহাগ-পরশ—তার বাহুতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তাকে আদর করছেন, অভয় দিচ্ছেন। চোখে ফুটে উঠেছে স্নেহসুকোমল দৃষ্টি।

বুকটা আইরিনের মোচড় দিয়ে ওঠে। সাধ জাগে, তুহাতে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে। স্বামীর প্রশস্ত বুকে মুখ গুঁজে অকপটে বলে যায় সব কথা। স-ব অপরাধ স্বীকার করে নিজের মুখে—এখ্‌খুনি, এই মুহূর্তে। ভেতরে ভেতরে সে দগ্ধে দগ্ধে মরছে উনি টের পেয়ে গিয়েছেন—এখন আর কিসের লজ্জা, কিসের ভয়।

কিন্তু, বড় উজ্জ্বল ওই ইলেকট্রিকের আলো—বড় নির্মম ওর উজ্জ্বলতা।

এত আলোয় মুখ তুলে সে চাইতে পারবে না।

'কেন তুমি মিছে ভেবে মরছ, ফ্রিজ।' ফের জোর করে হাসবার চেষ্টা করল আইরিন। 'এ কিছু নয়। এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে—দেখো'—বলতে বলতে কি ভেবে সর্বাঙ্গ তার শিরশিরিয়ে ওঠে।

আলিঙ্গনের জন্য এগিয়ে এসেছিল যে-হাতখানা, চোখের পলকে সেটা সরে গেল। ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল স্বামীর মুখখানি। চিন্তার রেখা পড়ল কপালে, ভুরু তুটি এল কুঁচকিয়ে। আস্তে আস্তে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'জানিনে কেন—তবু—কদিন ধরে কেবলি মনে হচ্ছে, আমায় যেন তুমি কিছু বলতে চাও।···কেন-যে মনে হচ্ছে! তুমি আর আমি···শুধু তুমি আর আমি জড়িত এমন কোন ঘটনা······আইরিন, এখানে আর কেউ নেই······'

আইরিন স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। স্বামীর স্থির-নিষ্কম্প দৃষ্টির সামনে যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছে।

হায়রে! আইরিন ভাবে, ছোট্ট ছুটি শব্দে কী সান্ত্বনা লুকিয়ে রয়েছে—'ক্ষমা করো!' একবার যদি মুখ ফুটে বলে—সাথে সাথে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অবসান হয়ে যাবে অমানুষিক এই মানসিক যন্ত্রণার। আর একটি প্রশ্নও স্বামী তাহলে করবেন না। কোনও দিনও না। 'ওগো, ক্ষমা করো'!—কী মধুক্ষরা এই কটি শব্দ।···'ক্ষমা করো···ক্ষমা করো'···

কিন্তু, বড় নিষ্ঠুর ওই আলো!

যদি অন্ধকার তাকে ঘিরে থাকত, যদি কেউ কারো মুখ না দেখতে পেত—অনায়াসে সে এখন স্বীকার করতে পারত সব অপরাধ। কিন্তু, ওই হিংস্র-প্রখর আলো শুষে নিয়েছে তার সবটুকু সাহস। সবটুকু সাহস আর সমস্ত শক্তি।

'তোমার তাহলে কিছু···একেবারে কিছুই আমায় বলবার নেই? ভেবে দেখ···' আস্তে আস্তে স্বামী বললেন।

মমতায় নিবিড় তাঁর কণ্ঠস্বর। শুনে স্বীকারোক্তির বড় লোভ জাগে আইরিনের। ভাবে, বলে ফেলে সব কথা। এমন সুযোগ আর আসবে না।—

শুধু, ওই হৃদয়হনন আলোটা যদি না জ্বলত অমন করে!··

কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে আইরিন বলল, 'কী তুমি বলতে চাও বুঝিনে বাপু!' বলে সশব্দে হেসে উঠল। কৃত্রিম হাসি, নিজের হাসি শুনে নিজেই আঁৎকে ওঠে। তবু বজায় রাখে মুখের হাসিটুকু। 'কি-একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি না দেখেছি—অমনি তুমি ধরে নিলে আমার বুঝি কোন গোপন রহস্য রয়েছে।

আশ্চর্য! কে জানে, হয়ত ভাবছ আমার একটি প্রেমিকও রয়েছে!'

শেষ কথাগুলি বলার সাথে সাথে ঝনঝন করে ওঠে মস্তিষ্ক। তাড়াতাড়ি আইরিন মুখ ফিরিয়ে তাকাল অন্যদিকে।

'বেশ। তবে এবার ঘুমোও।' কাটা কাটা স্বরে স্বামী বললেন। কথার সুরে কোমলতার লেশমাত্র নেই। আইরিনকে যেন তিনি হুমকি দিলেন।

আলো নিভিয়ে দিয়ে স্বামী চলে যাচ্ছেন, দরজায় তাঁর অপসৃয়মান অবয়ব—দুই চোখ বিস্ফারিত করে আইরিন তাকিয়ে—প্রেতের মত তিনি নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হলেন ঘর থেকে। বাইরে থেকে দরজার পাট দুটি টেনে বন্ধ করছেন—আইরিনের মনে হয়, তাকে যেন কফিনে পুরে তার ডালাটা উনি এবার আটকে দিচ্ছেন। পৃথিবীতে যেন থেমে গিয়েছে প্রাণের স্পন্দন, ফাঁপা হয়ে গিয়েছে শরীরটি তার—বুকটা কেবল ধড়াস ধড়াস করছে ভয়ানকভাবে। যন্ত্রণা! শুধুই যন্ত্রণা! বড় যন্ত্রণা! যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে প্রতিটি শিরা-উপশিরা।

পরের দিন।

স্বামী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে আইরিন জলখাবার খেতে বসেছে।

দুই ভাইবোনে এতক্ষণ ঝগড়া করে শান্ত হয়েছে এইমাত্র।

দাসী একটি চিঠি নিয়ে এল।

'আপনার চিঠি গিন্নিমা। এক্ষুনি জবাব চাইছে।'

খাম ছিঁড়ে ফেলে আইরিন চিঠিটা বার করল। সংক্ষিপ্ত এক লাইন চিঠিঃ 'দয়া করিয়া পত্রবাহকের হাতে একশত ক্রাউন দিয়া দিউন।'

মুহূর্তে মুখখানা তার ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

চিঠিতে কারো স্বাক্ষর নেই। ঠিকানা বা তারিখও না। তবু, কে যে লিখেছে বোঝা মোটেই দুষ্কর নয়। মার্কামারা হস্তাক্ষর।

টাকা আনবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে আইরিন নিজের ঘরে চলে গেল।

ক্যাশবাক্সের চাবিটা কোথায় রেখেছে তাড়াতাড়িতে মনে পড়ে না। একবার এ-ড্রয়ার হাতড়ায়, একবার ও-ড্রয়ার। অনেক খোঁজাখুঁজি শেষে পাওয়া গেল চাবি। কাঁপা-কাঁপা হাতে সে বের করে নিল একতাড়া নোট। তারপর নোটগুলি একটি খামে ভরে দাসীর হাতে সেটা দিয়ে দিল।

কাজগুলো করল আইরিন নিশিতে-পাওয়া মানুষের মত। যন্ত্রের মত পর পর করে গেল সবকিছু—বারেকের জন্যেও মনে কোন দ্বিধা জাগল না। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ফিরে এসে বসল খাবার টেবিলে।

এবার জাগল অস্বস্তি। কথা নেই কারো মুখে। পাথরের মত গুরুভার এই স্তব্ধতা বুকটাকে যেন তার দলে-পিষে দিচ্ছে।

ঠাট্টাতামাশার মধ্যে দিয়ে এই অস্বস্তিকর আবহাওয়াটা ভেঙে দেবার জন্যে আইরিন সোজা হয়ে বসেছিল, হঠাৎ তার চোখ পড়ে যায় সামনের দিকে—টেবিলের ওপর, তার প্লেটের ঠিক পাশেই, খোলা পড়ে রয়েছে চিরকুটটা।

তাকালেই চোখে পড়ে!

ইচ্ছে করলেই পড়তে পারে যে-কেউ!

আতঙ্কে হিম হয়ে গেল আইরিন।

চোরের মত অতি ভয়ে ভয়ে চিরকুটটায় হাত চাপা দিল, সন্তর্পণে সেটা মুঠো করে ধরে সরিয়ে ফেলল হাতখানি। তারপর তাকাল স্বামীর দিকে। তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে স্বামী তাকিয়ে রয়েছেন তারই দিকে। বিদ্বেষ আর জ্বালা ফুটে বেরুচ্ছে তাঁর চাউনিতে।

স্বামীর এমন চাউনি আইরিন জীবনে কোনদিন দেখেনি। তীক্ষ্ণ শলাকা হয়ে ওই চাউনি যেন তার মর্ম্মমূলে গিয়ে বিঁধছে। কি করে এই আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবে? কাল সন্ধ্যার সেই আনন্দের আসরেও এমনি মর্মভেদী দৃষ্টিতে উনি তাকিয়ে ছিলেন—অবিকল এমনি বিদ্বেষ আর জ্বালা ফুটে বেরিয়েছিল ওর চাউনিতে।

ক্ষুরধার খড়্গের মত তার ঘুমের শিয়রে রাতভোর উদ্যত হয়ে ছিল এই চাউনি—হিংস্র ভয়ঙ্কর এই দৃষ্টিপাত।

কিছু-একটা বলা দরকার। এই স্তব্ধতাকে ভাঙা দরকার। আইরিন চেষ্টা করে। কিন্তু, প্রাণপণ চেষ্টাতেও গলা দিয়ে তার

স্বর বেরোয় না। কি বলবে···কি বলা উচিত···কি করে বলবে—ভেবে ভেবে সারা হয়ে যায়।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে, বহুদিন-ভুলে-যাওয়া একটি ঘটনার কথা—স্বামীই একদিন বলেছিলেন। এক মামলায় প্রতিবাদী পক্ষে ছিলেন স্বামী। সরকারি উকিল সেই মামলায় কিভাবে এক অবাধ্য সাক্ষীকে বেকায়দায় ফেলে শায়েস্তা করেছিলেন—উনি এসে সেটা গল্প করেন। সরকারি উকিল এমন ভাব দেখাচ্ছিলেন যেন চোখে তিনি ভাল দেখতে পান না। তাই টেবিলের ওপর ছড়ানো নথিপত্রগুলির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন। ভ্রূক্ষেপ নেই আর কোনদিকে! কিন্তু, সওয়াল শুরু হওয়া মাত্র চোখ তুললেন আচমকা, এমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চাইলেন সাক্ষীর দিকে যে তার মিথ্যে কথার জাল মুহূর্তে কুটি কুটি হয়ে ছিঁড়ে গেল। লোকটা ভাববার ফুরসৎটুকু পর্যন্ত পেল না—হড়বড় করে বলে ফেলল সত্যি ঘটনাটা।

স্বামীও কি আজ সেই কৌশল প্রয়োগ করছেন তার ওপর?

আইরিন জানে, ব্যারিস্টার হিশেবে উনি শুধু আইন নিয়েই মাথা ঘামান না—মনস্তত্ব বিশ্লেষণও ওঁর কার্যক্রমের অচ্ছেদ্য একটা অঙ্গ। সাধারণ লোকে যেটা ভুলেও ভাবে না, ভাবতেও পারে না—তারই সূত্র ধরে উনি অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন।

তাই তো এত ভয় ওঁকে। ভালোভাবে ওঁকে জানে বলেই না ওঁর এই নির্বাক দৃষ্টির সামনে আতঙ্কে সে দিশেহারা হয়ে

যাচ্ছে। পাকা জুয়াড়ী যেমন তন্ময় হয়ে জুয়া খেলে—অপরাধের সন্ধান পেলে উনিও তেমনি নাওয়া-খাওয়া ভুলে যান। অপরাধের সূত্র ধরে তার উদ্দেশ্য, তার হেতু, তার খুঁটিনাটি বিবরণ ইত্যাদি বার করবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগেন। মেতে ওঠেন জটিল এক মনস্তাত্ত্বিক খেলায়।

বড় মারাত্মক এই খেলা!

সঙ্গে সঙ্গে পুরো মানুষটারই যেন ঘটে যায় আমূল পরিবর্তন। জ্বলন্ত এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয় যেন। উত্তেজনা যখন চরমে পৌঁছোয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধটুকুও থাকে না। মুখের কাছে এগিয়ে দিলেও কিছু খেতে পারেন না। সব সময় আত্মগত। হয়ত মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে বসলেন—কোন ঘোরালো সমস্যার সমাধান করতে। পাইপ টানছেন তো টানছেনই। বিশেষ করে, মামলার আগের কদিন—মুহূর্তের জন্যেও পাইপ নামান না। কথাবার্তা একদম বলেন না—সব শক্তি মুলতুবি করে রাখেন, শক্তি সঞ্চয় করেন—বাদী বা বিবাদী যে পক্ষেই দাঁড়ান, আদালতে দাঁড়িয়ে সওয়ালের জন্যে, নিজের কর্তব্য যথোচিতভাবে পালন করবার জন্যে—প্রস্তুত হন।

আইরিন একদিন গিয়েছিল আদালতে। গিয়েছিল স্বামীর সওয়াল-জবাব শুনতে। স্বামী সেবার বাদীপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন।

সে-স্মৃতি মনে পড়লে আজো হৃৎকম্প জাগে।

সে কী ভয়ঙ্কর চাউনি ওঁর! গলার স্বরে সে কী প্রচণ্ড

আবেগ! কী নিষ্ঠুরভাবেই বিপক্ষ সাক্ষীদের সমস্ত যুক্তিতর্ককে ধূলিসাৎ করে দিলেন!

অমন শান্ত সংযত মানুষটা আদালতে দাঁড়িয়ে কিরকম বদলে গিয়েছিলেন!—ভাবা যায় না।

তারপর থেকে আইরিন প্রতিজ্ঞা করেছে, মরে গেলেও আর কক্ষনো সে ও-মুখো হচ্ছে না।

কিন্তু আজ? আজ সে—ওঁরই স্ত্রী হয়ে সে আজ দাঁড়িয়েছে আসামীর কাঠগড়ায়! দাঁড়িয়েছে ওঁর ওই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে! ·····

মুখ ফুটে আইরিন কিছু হয়ত বলতে যাচ্ছিল, জোর করে দুই ঠোঁট চেপে চুপচাপ বসে রইল। না, কথা বলা এখন ঠিক হবে না।

আবার, চুপচাপ এভাবে বসে থাকার পরিণাম ভেবেও সে বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

কথা বললেও বিপদ, এরকম মুখ বুজে থাকলেও হবে হিতে বিপরীত!

কপাল ভালো, খাওয়ার পাট এবার চুকল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা হৈচৈ করতে করতে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে শুরু করে দিল হুটোপাটি। গভর্নেস তাদের থামাবার জন্যে ধমকাতে লাগল।

আইরিনও উঠে দাঁড়াল। কোনদিকে না তাকিয়ে চলে গেল তার পড়বার ঘরে।

এখন সে একা। পকেট থেকে বার করল সেই চিরকুটটি। সামান্ত চিরকুট তো এ নয়—তার মৃত্যু-পরোয়ানা! আবার পড়ল: 'দয়া করিয়া পত্রবাহকের হাতে একশত ক্রাউন দিয়া দিউন।'

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়।

চিরকুটটা দলা পাকিয়ে মারবেলের মত শক্ত করে আইরিন ছুঁড়ে ফেলল কাগজ-ফেলার ঝুড়িতে। কিন্তু—সর্বনাশ! ওভাবে ওটাকে ওখানে তো ফেলে দেওয়া যায় না। তাড়াতাড়ি উবু হয়ে বসে কাগজপত্র ঘেঁটে ফের সেটাকে খুঁজে বার করল। এবার ফেলে দিল অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে।

আগুনের লোলুপ শিখা লকলকে জিব বের করে এগিয়ে আসে—ওই ঘৃণ্য জিনিসটা কুঁকড়ে যায় ধীরে ধীরে। বিবর্ণ হতে হতে পরিণত হয় ভস্মে।

আশু বিপদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে ঘর থেকে বেরোবার জন্মে পিছন ফিরল আইরিন।

বেরনো কিন্তু হল না। বারান্দায় কার পদশব্দ এগিয়ে আসছে।

আর কার!

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন! অগ্নিকুণ্ডের তাতে একেই মুখটা তার জ্বলে যাচ্ছে, তার ওপর সামনে দাঁড়িয়ে স্বামী! ধরা পড়ে গিয়েছে হাতেনাতে। কান দিয়ে যেন আগুন ছুটতে থাকে। অগ্নিকুণ্ডের ঢাকনিটা এখনো খোলা রয়েছে, শরীর দিয়ে

ওটাকে আড়াল করে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। পা টলমল করে আইরিনের।

সিগার ধরাবার জন্যে স্বামী দেশলাই জ্বালালেন। দেশলাইয়ের ক্ষণিক আলোয় উদ্ভাসিত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আইরিনের মনে হয়—উত্তেজনায় ওর নাকের বাঁশি যেন কাঁপছে থরথর করে। অর্থাৎ, উনি ভয়ানক রেগে গিয়েছেন—স্পষ্ট বুঝল।

তবু স্বামী নরম চোখেই তাকালেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'তোমায় একটা কথা বলতে এলাম—শোনো, তোমার ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আমায় যদি না দেখাতে চাও, দেখিও না। আমি কোনরকম আপত্তি করব না। তুমি যদি খুশি হও—তোমার গোপন কথা আমায় না জানাতেও পারো। সে-বিষয়ে পুরো স্বাধীনতা তোমার রয়েছে।'

আড়ষ্ট হয়ে রইল আইরিন। ঠোঁট দুটি যেন জুড়ে গিয়েছে। চোখ তুলে চাইবার সাহস নেই।

দু' এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলেন স্বামী। তারপর ভক করে সিগারের ধোঁয়া ছাড়লেন—ধোঁয়াটা যেন ছুঁড়ে মারলেন আইরিনের মুখ লক্ষ্য করে।

তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ভাগনার-গৃহিনী আর ভাবতে পারে না। আর সে ভাবতে চায় না।

এখন সে শুধু চায় শান্তি। শুধু চায় কোনমতে এই জীবনের বোঝা বয়ে চলতে।

অসহ্য হয়ে উঠছে এই বাড়ি। এক দণ্ড আর এখানে মন টেকে না। ইচ্ছে করে সব সময় বান্ধবীদের সাথে সাথে কাটায়—এর-ওর বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। নইলে আতঙ্কে সে উন্মাদ হয়ে যাবে।

একশ ক্রাউনের ঘুষে কদিন বাঁচবে ওর হাত এড়িয়ে?

খানিকটা বেড়িয়ে এলে হয়তো ভাল লাগবে। তাছাড়া, কিছু কেনাকাটারও দরকার রয়েছে। বাইরে গেলে কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তি পাবে এই সংসারের বন্দিশালা থেকে।

বন্দিশালা ছাড়া কি এটা? সব সময় সকলের চোখ তার ওপর, তার অস্বাভাবিক চালচলন অবাক হয়ে দেখছে সবাই—আইরিন তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে।

বাড়ি থেকে বেরোবার জন্যে আইরিন প্রস্তুত হল।

বড় বিচিত্র তার এই প্রস্তুতি। সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প্রথমে তাকাল রাস্তার, তারপর মানুষের মিছিলের দিকে। তাকিয়ে চোখ বুজল—সাঁতারু যেন স্প্রিংবোর্ড থেকে জলে ঝাঁপ দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। একবার পায়ের তলায়

রাজপথের স্পর্শ পেলে আর ভয় নেই—জনস্রোতে ভেসে চলে যাবে অনায়াসে। সত্যিকারের ভদ্রমহিলার মত মাথা উঁচু করে চলতে পারবে—আশেপাশে কোনদিকে দৃকপাত না করে।

রাস্তায় নেমে আজ সে চলতে লাগল মাথা হেঁট করে—পাছে চোখাচোখি হয়ে যায় সেই ভয়ঙ্কর একজোড়া চোখের সাথে।… আজও যদি ওর পিছু নেয়, আইরিন গ্রাহ্যও করবে না।…তবু, থেকে থেকে কেন-যে মনটা আশঙ্কায় দুলে ওঠে! কারো মুখোমুখি পড়ে গেলেই ধক করে উঠছে বুকটা! পাশে খুট করে কোন শব্দ হওয়া মাত্র চমকে যাচ্ছে!

পেছনের প্রত্যেকটি পদশব্দ শক্তিশেল হয়ে বুকে বাজে। চারদিকে যেন তার মানুষ নয়, প্রেতের সঞ্চরণ। কোন বান্ধবীর বাড়ি গিয়ে না পৌঁছনো পর্যন্ত ভালো করে নিশ্বাস নিতেও পারবে না আইরিন।

এক ভদ্রলোক টুপি খুলে নমস্কার জানালেন। তার দিকে তাকিয়ে আইরিন খুশি হল। ভদ্রলোক তাদের পারিবারিক বন্ধু। অত্যন্ত অমায়িক, তবে কথা একটু বেশি বলেন—বাচাল প্রকৃতির মানুষ যাকে বলে। সাধারণত এঁকে আইরিন এড়িয়ে চলে। কেননা সুযোগ পাওয়ামাত্র নিজের যাবতীয় দুঃখদুর্দশার বিশদ বর্ণনায় ভদ্রলোক মশগুল হয়ে পড়েন। আজ কিন্তু আইরিন এর সাহচর্য পেলে বর্তে যেত। ইশ, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে! কেন ওঁকে যেতে দিল? অভ্যাসবশে? কিন্তু, উনি

পাশে থাকলে ওই ব্ল্যাকমেলারটা যে কাছে ঘেঁষতে পারত না—এটা কেন সে খেয়াল করেনি! ফিরে ডাকবে?

পাশ ফিরে ভদ্রলোককে ডাকতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নজরে পড়ল—হনহন করে একজন এগিয়ে আসছে তারই দিকে। কে আসছে দেখবার অবসর নেই, সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে আইরিন ঊর্ধ্বশ্বাসে এগোতে লাগল। অন্ধের মত এগিয়ে চলল।

আবার ও পিছু নিয়েছে!

একটু পরেই কাঁধের ওপর ওর কুৎসিৎ হাতটা এসে পড়বে!

মনে হতেই কাঁধ ছুটো শিরশির করে ওঠে। সারা শরীরে বয়ে যায় আতঙ্কের শিরশিরানি।

আসছে! আসছে! ক্রমেই ও এগিয়ে আসছে—কাছে এসে পড়ছে!

কি করে পালাবে আইরিন? পালাবে কোথায়? ঠক ঠক করছে তার হাঁটু ছুটি, অসম্ভব আর পথ চলা।

ওই এল! এই বুঝি তার কাঁধে হাত রাখল! আরো কাছে এসে পড়েছে। একেবারে পিছনে! গায়ে গায়ে! এবার—

তার কানে এসে বাজল নরম একটি কণ্ঠস্বর। নরম অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্পষ্ট উচ্চারিত হল তার নাম—

'আইরিন!'

কিন্তু না, যে-কণ্ঠস্বর সে আশঙ্কা করছিল তা তো নয়। চকিতে ঘুরে দাঁড়াল আইরিন—হুমড়ি খেয়ে তার ওপর পড়তে কোনমতে সামলে নিল কার্ল ক্রস্টম্যান।

আবেগের উত্তেজনায় কার্লের মুখখানা শাদা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এমন নিরাসক্ত নিস্পৃহ চোখে আইরিন তার দিকে তাকাল যে লজ্জায় সে থতমত খেয়ে গেল। তবু করমর্দনের জন্যে বাড়িয়ে দিল হাতখানা। আইরিন চেয়েও দেখল না। হতাশ হয়ে হাত বেচারা নেতিয়ে পড়ল আস্তে আস্তে।

এখানে, এখন, এভাবে কার্লের সাথে দেখা হয়ে যাবে—আইরিন কল্পনাও করতে পারেনি। সে-ও বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েক সেকেণ্ড পরে তার খেয়াল হয়—একি! অমন মুগ্ধ চোখে ওর দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে কেন!

গত কয়েকদিন ধরে মুহূর্তের জন্যেও প্রেমিকের কথা তার মনে হয় নি। সব সময় তার মন জুড়ে ছিল আতঙ্ক—প্রেম বা প্রেমিকের প্রসঙ্গ ভাববার অবসর ছিল না। কিন্তু এখন ওর বিবর্ণ মুখের দিকে, জিজ্ঞাসায়িত দুই চোখের দিকে তাকিয়ে ক্ষেপে যায় সে। বুকের মধ্যে উথলে ওঠে ক্রোধের জোয়ার। ঠোঁট দুটি এমনভাবে থরথর করতে থাকে যে স্পষ্ট করে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারে না।

তার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে গেল কার্ল।

'আইরিন, কি ব্যা-ব্যা-ব্যাপার বল তো?' কথা বলতে গিয়ে কার্ল তোতলাতে থাকে।

তীব্র চোখে তাকাল আইরিন।

'আ-আমি কি কোন অন্যায় করেছি?' মিন মিন করে কার্ল বলল।

'অন্যায় করেছি!' ফেটে পড়ল আইরিন। 'না না—অন্যায় তুমি করবে কেন—তুমি কি অন্যায় করতে পার!' বিদ্রূপ করে বলল, 'তুমি যা করো স-ব ভালো ভালো কাজ। এমন সব ভালো কাজ তুমি করো যে—'

হাঁ হয়ে গেল কার্ল।

'তুমি···তুমি কি বলছ?···আমি···'

'থাক! রাস্তায় আর নাটক করো না!' গম্ভীর স্বরে আইরিন বলল, 'তোমার কাঁদুনি আমি শুনতে চাইনে। তোমায় আমি ভাল করেই চিনেছি। দেখো—ধারেকাছেই হয়ত তোমার প্রাণের উনি ওৎ পেতে রয়েছেন। একজন চলে গেলেই আরেকজন এসে হামলা—'

'কার কথা তুমি বলছ?'

আইরিনের ইচ্ছে হল, ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দেয় ওর গালে। ভড়ং কত! যেন কিচ্ছুটি জানেন না! উজবুকের মত কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দেখ না!

ছেলেটাকে দেখে সর্বদেহ তার ঘৃণায় রী রী করে ওঠে—এতখানি ঘৃণা জীবনে বোধ হয় কাকেও সে করেনি।

'আইরিন···আ-আ-আইরিন'—বিভ্রান্ত কার্ল, কথা তার কেবলি জড়িয়ে জড়িয়ে যায়, 'কেন তুমি আমার ওপর রাগ করছ, আইরিন! আমি কী দোষ করলাম! হঠাৎ তুমি ঠিক করলে, আমার সাথে আর দেখা করবেনা···কেন, কি বৃত্তান্ত—ভগবান জানেন···অথচ এদিকে আমি দিন রাত তোমার পথ

চেয়ে বসে থাকি···আজ সকাল থেকে তোমাদের বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছি, শুধু দুটো কথা'—

'অ্যাঁ! আমাদের বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলে! তুমিও! তুমিও!' রাগে মুখ দিয়ে কথা সরে না আইরিনের। কী শয়তান! ওর মুখের ওপর প্রাণপণে একটা ঘুষি মারতে পারলে মন বুঝি তার কিছুটা তৃপ্তি পায়। ও-ও দাঁড়িয়ে ছিল তাদের বাড়ির কাছে! ও-ও তার ওপর নজর রেখেছে!

কোন মতে নিজেকে আইরিন সংযত করে রইল। দুই চোখে ফুটিয়ে তুলল বিদ্বেষ আর ঘৃণা। ভাবতে লাগল, নিজের মনের কথাটা ওকে বলবে কিনা। ওর সম্পর্কে তার কি ধারণা হয়েছে মুখের ওপর জানিয়ে দেবে সে-কথা?

কী দরকার!

কিছু না বলে হঠাৎ সে পিছন ফিরল—ফিরেই কোনদিকে না তাকিয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করে দিল। মিশে গেল জনতায়।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কার্ল। বিভ্রান্ত দুই চোখের দৃষ্টি, হাত দুটি অসহায় হয়ে ঝুলে পড়েছে দু'পাশে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মত। তারপর একসময় প্রবল জনস্রোত তাকে টেনে নিল আপন বুকে, ভাসিয়ে নিয়ে চলল। ঝরাপাতার মত জনতা-প্রবাহে কার্ল ভেসে চলল—ভেসে চলল না-জানা সমুদ্রের সন্ধানে।

শান্তির জন্যে আইরিন বড় লালায়িত হয়ে উঠেছিল, পরের দিন ফের একটা চিরকুট পাওয়ার সাথে সাথে ধূলিসাৎ হয়ে যায় তার সমস্ত আশা। আবার টাকার তাগাদা! এবার একশ নয়, তার দ্বিগুণ—দু'শ ক্রাউন!

নতুন করে আতঙ্কের চাবুকে সে জর্জরিত হয়ে ওঠে। তবু বিনা প্রতিবাদে দাবি মেনে নেয়।

কিন্তু, এরপর?

এইভাবে যদি দিনকে দিন দাবির বহর বেড়ে চলে, উপায়? তার নিজের হাতে অবিশ্যি বেশ-কিছু রয়েছে, কিন্তু সকলের চোখ এড়িয়ে এভাবে ওর খাঁই মিটিয়ে চলা সম্ভব কতদিন?

চাই-কি, কালই হয়ত ও চারশ ক্রাউন চেয়ে বসবে। তারপর শ'য়ে শ'য়ে বেড়ে পৌছুবে হাজারে।

হাজারেও হয়ত রেহাই মিলবে না, তাকে একেবারে নিঃস্ব না করে ছাড়বে না।

নিঃস্ব হয়ে গেলেও কি নিস্তার পাবে?

পাবে না। তখন আসতে থাকবে বেনামা চিঠি। চিঠির পর চিঠি।

তারপর—ঘটবে একদিন অনিবার্য সেই বিপর্যয়!

সর্ব-নাশ!

অসম্ভব এই বিপর্যয়ের হাত এড়ানো। ঘুষ দিয়ে সে এখন

শুধু সময় নিচ্ছে, অর্থমূল্যে সময় কিনছে। সেই চরম সর্বনাশের মুখোমুখি হবার আগে কিছুদিনের জন্যে স্বস্তিতে বাঁচতে চাইছে।

কিন্তু কোথায় স্বস্তি, কোথায় শান্তি! প্রতিটি মুহূর্ত কাটে আতঙ্কে। আতঙ্কে, আশঙ্কায়, উৎকণ্ঠায়। দুদণ্ড বসে পড়তে পারে না, সেলাইয়ে হাত চলে না। একেক সময় এত দুর্বল আর এমন অসুস্থ লাগে যে চলাফেরা পর্যন্ত করতে পারে না। মাথা ঘোরে, চোখে অন্ধকার দেখে, অবশ হয়ে আসে হাত-পা। বসে থাকতে হয় তখন। চুপচাপ। ক্লান্ত, অবসন্ন।

এত ক্লান্তি, অথচ রাতে এক ফোঁটা ঘুম নেই। বিছানায় ছটফট করতে করতে কাটে বিনিদ্র রাত!

মনের ভাব তবু প্রকাশ করা চলবে না। তবু যথারীতি হাসতে হয়, কথা কইতে হয়—চালচলনে স্বাভাবিকতা বজায় রেখে চলতে হয়। এ যে কী অমানুষিক ব্যাপার, কে বুঝবে! চব্বিশ ঘণ্টা নিজের সাথে কীভাবে যে যুঝতে হয় বেচারা আইরিনকে!

চারপাশে যারা রয়েছে তার মধ্যে একজন শুধু আইরিনের ব্যথাটা যেন বোঝে। মনে হয়, শুধু সে-ই জানে কিভাবে আইরিন দগ্ধে দগ্ধে মরছে। কেননা সব সময় যে তার চোখ রয়েছে স্ত্রীর দিকে।

আর, সদাসতর্ক এই প্রহরার ফলে আইরিনকে আরো-বেশি

সতর্ক হয়ে চলতে হয়। নিজে সতর্ক হওয়ার সাথে সাথে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় স্বামীর প্রতিটি গতিবিধির ওপর।

স্বামী গোয়েন্দাগিরি করছে স্ত্রীর ওপর, স্ত্রী স্বামীর ওপর। দিনরাত!

আশ্চর্য এক লুকোচুরি খেলা শুরু হয়ে গেছে দুজনের মধ্যে। দুজনই অবিশ্বাস করে দুজনকে—অথচ কেউই এ-সম্পর্কে সচেতন নয়। কাজটা যে অন্যায়—একজনেরও সেটা খেয়াল হয় না। তাই সেজন্যে লজ্জা বা অনুতাপও নেই কারো মনে।

ব্যাপারটা শুরু হওয়ার পর থেকে স্বামী বদলে গিয়েছেন অনেকখানি। প্রথমে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন, তার জায়গায় এখন দেখা দিয়েছে শান্ত সহিষ্ণুতা। বিয়ের প্রথম দিকের মানুষটাকে মনে পড়ে। এমন ব্যবহার করেন তার সাথে যেন সে ভীরুহৃদয় কিশোরী এক। স্ত্রীর জন্যে দরদের তাঁর অন্ত নেই।

সেই সঙ্গে অন্ত নেই তার স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টারও। আইরিন যাতে সব কথা তাঁকে খুলে বলে—সুযোগ পেলেই তার পথ তিনি পরিষ্কার করে দেন। পরিষ্কার করে দেন মিষ্টিমধুর নানা কথা বলে, প্রেম-প্রীতির নিদর্শন দেখিয়ে।

আইরিন সব বোঝে। বোঝে যে সত্যিই স্বামী তার কত সহৃদয়। কিন্তু—লজ্জা!

মুখ ফুটে কি করে একথা বলবে ওঁকে!

তা সে মরে গেলেও পারবে না। তাই ক্রমেই সে নিজেকে গুটিয়ে নেয় বেশি করে—এড়াতে চায় স্বামীর অযাচিত অনুগ্রহ।

সরাসরি স্বামী একদিন প্রসঙ্গটা তুললেন।

আইরিন বেড়াতে বেরিয়েছিল, বাড়ি ফিরে শোনে নার্সারীতে ভীষণ হট্টগোল। স্বামী উত্তেজিত, তাঁর গলা বেশ চড়া। গভর্নেস ধমকাচ্ছে চাপা স্বরে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ছেলেমেয়েরা কাঁদছে।

শুনেই সে আঁৎকে ওঠে। তবে কি তার অনুপস্থিতিতে ফের এসেছিল সেই চিরকুট? ভাবতেই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। কোনমতে নিজেকে সে টেনে নিয়ে চলল, টলতে টলতে উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।

ব্যাপারটা কিন্তু আসলে গুরুতর কিছুই নয়। সুজি খুড়ী কদিন আগে যে খেলার ঘোড়াটা দিয়েছিলেন, তাই নিয়ে ঝগড়া। ঘোড়াটা রুডি পাওয়ায় মনে মনে ভীষণ হিংসে হয়েছিল হেলেনের। এমন সুন্দর খেলনাটা ভাই একা পাবে? তাছাড়া, ভাই কিনা ওটা একবার ছুঁতেও তাকে দেয় না? তাই রাগে অভিমানে দিশেহারা হয়ে গিয়ে হেলেন করেছিল কি, ঘোড়াটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে লুকিয়ে রেখেছিল আলমারির নিচে।

আজ ধরা পড়ে গেছে ব্যাপারটা।

হেলেন অবিশ্যি প্রথম থেকেই জোর গলায় না না করছে।

কিছুতেই দোষ কবুল করে না। গভর্নেস তখন বাধ্য হয়ে ওদের বাবাকে ডাকে বিচারের জন্যে।

আইরিন যখন ঘরে ঢুকল, রীতিমত এক বিচারপর্ব শুরু হয়ে গেছে। আসামী বেকসুর অপরাধ অস্বীকার করে চলেছে। মামলার সাক্ষী গভর্নেস, বাদী রুডি।

বেশিক্ষণ নিজেকে হেলেন সামলে রাখতে পারল না। খানিক পরেই বেচারি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

আইরিন তাকিয়ে আছে বিচারক স্বামীর দিকে—আর কোনদিকে তার দৃষ্টি নেই। মনে হচ্ছে, স্বামী যেন—সন্তান নয়—তারই বিচার করতে বসেছেন! আইরিনই আসামী!

কে জানে, কালই হয়ত তাকে দাঁড়াতে হবে আসামীর কাঠগড়ায়—দাঁড়াতে হবে অবিকল ওই হেলেনের মত, ওরই মত কাঁপতে হবে থরথর করে, ঝরঝর করে কাঁদতে হবে। অবিকল নিজের মেয়ের মত!

যতক্ষণ হেলেন মিছে কথা বলছিল—বাপ তাকিয়ে ছিলেন কঠোর দৃষ্টিতে, কথা বলছিলেন গম্ভীর গলায়। কিন্তু নিজের দোষ সে স্বীকার করতে শুরু করা মাত্র—নরম হয়ে এল তাঁর চোখের চাউনি, কোমল হয়ে এল গলার স্বর। ধীরে ধীরে তিনি মেয়েকে তখন বোঝাতে লাগলেন—কী অন্যায়ই না সে করেছে। ছোট ভাইয়ের খেলার জিনিস কি এমন করে ভাঙতে হয়? ছিঃ! এসব হল গিয়ে দুষ্টু মেয়ের কাজ। হেলেন কি অবে দুষ্টু মেয়ে?

বাপের কথা শুনে, নিজের দুষ্টুমির কথা মনে হওয়ায় হেলেন আবার কাঁদতে শুরু করে দেয়। অকপটে স্বীকার করে ফেলে সব অপরাধ।

তাড়াতাড়ি মেয়ের পাশে ছুটে যায় আইরিন। মেয়ে কিন্তু মাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

স্বামীও তাকে ভর্ৎসনা করেন—এখন আদর জানানো ঠিক নয়। তাহলে ও প্রশ্রয় পেয়ে যাবে। আসামীকে সাজা না দিয়ে ছেড়ে দিতে তিনি নারাজ। সাজা হেলেনকে পেতেই হবে।

কাল এক জায়গায় দু' ভাইবোনের নেমন্তন্ন। গত একমাস ধরে কালকের জন্যে ওরা দুটিতে হাপিত্যেশ করে রয়েছে। কিন্তু এই অপরাধের সাজা হিশেবে কাল বাড়ি থেকে হেলেনের বেরুনোই চলবে না—নেমন্তন্নে যাওয়া তো দূরস্থান।

ভয়ঙ্কর সাজা, সন্দেহ কি! রায় শোনার সাথে সাথে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে দিল হেলেন। আর রুডি ঘরময় লাফাতে লাগল মনের আনন্দে।

কিন্তু, তার আনন্দও স্থায়ী হল না বেশিক্ষণ। কেননা গম্ভীরভাবে বাপ জানিয়ে দিলেন, অন্যের দুঃখে আনন্দে নাচানাচি করা অত্যন্ত অভদ্রতা। এবং ছেলেকে ভদ্রতা শেখাবার জন্যে তিনি ঘোষণা করলেন—ভাই বোন কেউই কালকের নেমন্তন্নে যেতে পারবে না। ব্যস!

বাদী ও আসামী এবার একমন একপ্রাণ হয়ে চলে গেল

ঘর থেকে। ভাইবোনের দুঃখ এখন সমান সমান। দুজনেই এখন সমব্যথী।

ঘরে রইল শুধু স্বামী আর স্ত্রী।

একবার আইরিনের মনে হয়—এই সুযোগ। নিজের অপরাধ যদি স্বীকার করতে হয়—এই সময়। মেয়ের দুষ্টুমিকে উপলক্ষ্য করে অনায়াসে কথা শুরু করতে পারে। প্রথমে মেয়ের পক্ষ নিয়ে বলবে, যদি দেখে স্বামী সহৃদয়ভাবে শুনছেন—নিজের কথা পাড়বে তখন।

'আমি বলছিলুম কি···ইয়ে···সত্যিসত্যিই ওদের নেমন্তন্নে যেতে দেবে না? তাহলে ওরা কিন্তু মনে বড্ড কষ্ট পাবে··· বিশেষ করে হেলেনটা।···আর·· এমন কীই-বা ও করেছে! ওই তো একফোঁটা মেয়ে···তুমি কি ওকে সাজা না দিয়ে ছাড়বে না, হ্যাঁগা? এত সামান্য ব্যাপারে···ওর জন্যে কি তোমার একটুও দুঃখ হচ্ছে না?'

স্বামী স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন।

'ওর জন্যে দুঃখ? হ্যাঁ, তা হচ্ছে। তবে এখন সেকথা ভেবে ওকে সহানুভূতি জানাবার দরকার নেই। নেমন্তন্নে যেতে না পারার জন্যে ও কষ্ট পাবে ঠিক, কিন্তু সে-কষ্ট এমন-কিছু নয়। সহানুভূতির দরকার ছিল বরং কাল। ভাঙা ঘোড়াটার খোঁজে সারা বাড়ি যখন আমরা তন্নতন্ন করছিলাম, কে ওটা ভাঙতে পারে ভেবে সারা হচ্ছিলাম—ওর তখনকার মনের অবস্থাটা একবার কল্পনা কর দেখি। উৎকণ্ঠায় বুক দুরদুর

করছে—স্পষ্ট বুঝছে যে ব্যাপারটা আজ হোক কাল হোক জানাজানি হয়ে যাবেই, তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে ভরসা পাচ্ছে না। সাজার চেয়ে এই যে অনিশ্চিত আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা—এ অনেক-বেশি ভয়ঙ্কর। কেননা, সাজার মেয়াদ একসময় শেষ হয়—কিন্তু এই আতঙ্ক বা উৎকণ্ঠা অশেষ। এর চেয়ে বড় সাজা আর কি হতে পারে? খুকিকে আমি যে সাজা দিলাম তাতে ওর শাপে বর হল—সেই উৎকণ্ঠার হাত থেকে বেচারি রেহাই পেয়ে বেঁচে গেল। মেয়ের চোখের জল দেখে ভুল বুঝো না। কাঁদছিল ও কাল থেকেই—গোপনে গুমরে গুমরে কাঁদছিল বলে চোখ দিয়ে জল পড়েনি—তাই বলে কি সে-কান্নায় কষ্ট কিছু কম? বরং এর চেয়ে তাতে যন্ত্রণা বেশি। এখন ও প্রাণ খুলে কাঁদতে পারবে। আর ওর গোপন করবার কিছু রইল না। মনে মনে দগ্ধে মরার চেয়ে···'

নিজের স্ত্রী, না মেয়ে—কাকে লক্ষ্য করে কথাগুলি বলছেন উনি? আইরিন তাকিয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে স্বামীর মুখখানি।

স্বামীর খেয়াল নেই। একটানা তিনি বলে চললেন, 'আমি যা বলছি, এই সত্যি জেনো। এতদিন আইনের ব্যবসা করে এটা আমি ভালোভাবেই বুঝেছি। অভিজ্ঞতা তো জীবনে কম হল না। দেখেছি তো, আসামী যতক্ষণ না দোষ কবুল করে, ততক্ষণ তার মনে আতঙ্ক-উৎকণ্ঠার অবধি থাকে না। ধরা পড়ে যাবার ভয়, সত্যকে গোপন রাখার আপ্রাণ প্রয়াস—এই দুইয়ের

প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব যেন ওঠে তার মনে। কত বড় বড় সেয়ানা আসামী বলে এর ফলে ভেঙে পড়ে! প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হচ্ছে—অনর্গল প্রশ্নের তোড়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে সত্যটা—আসামীর চোখেমুখে তখন এমন ভাব ফুটে ওঠে যেন একটি দাঁত তার টেনে উপড়ে ফেলা হচ্ছে। আবার কখনো স্বীকারোক্তি দেবার জন্যে হঠাৎ সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু পারে না—মনে হয়, হঠাৎ কে যেন তার কণ্ঠনালি চেপে ধরল। কণ্ঠনালী চেপে ধরে তার ভেতরের শয়তানটা—ভয় আর দুর্বুদ্ধি থেকে জন্ম যে শয়তানের। তখন ফের নতুন করে শুরু হয়ে যায় তার মানসিক সংঘাত! শুধু কি আসামী? বিচারকেরও কি এর ফলে কম অশান্তি সইতে হয়! বরং এই মনস্তাত্বিক লড়াইয়ে আসামীর চেয়ে তার মনোকষ্টই বেশি। অথচ আসামীর চোখে সে তখন শত্রু, আসামী ভাবতেও পারে না যে তাকে সাহায্য করবার জন্যই বিচারক ব্যগ্র। আমার কথা যদি ধরো—আমি অবিশ্যি আসামীকে শেষ পর্যন্ত মিছে কথা বলে যাবারই পরামর্শ দিই। কেননা আসামী পক্ষের উকিল হিশেবে এই আমার কর্তব্য। তাই বলে কি সব সময়েই তা চলে? চলে না। কারণ আমি যে জানি—দণ্ডাদেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত উৎকণ্ঠার অবসান হয়ে যাবে। তখন আর তার গোপন করার কিছু থাকবে না।…আমি তো ভেবেই পাইনে জেনেশুনে লোকে খারাপ কাজ করে কেন? যদি করেই—সেকথা স্বীকার করবার সাহসটুকু কেন থাকবে না? শুধু একটা মুখের কথা, শুধু

একবার মুখ ফুটে নিজের অপরাধ স্বীকার করা—এর জন্যে এত ভয়? কোন মানে হয় না এই ভয়ের। আসল অপরাধের য়ে এই ভয়ের জন্যে যে আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা—'

'তাহলে কি তুমি মনে করো—সত্যকে গোপন করার প্রধান ভয়? লজ্জা বলে কিছু নেই? নিজমুখে সব স্বীকার লজ্জা, স্বেচ্ছায়—যাকে বলে—স্বেচ্ছায় নিজেকে সবার নিরাবরণ করার—'

কিছুটা বিস্মিত ও বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন। চনায় আইরিন এমনভাবে অংশ নেবে, তিনি ভাবতে ।

? লজ্জা হল ভয়েরই আরেক দিক। স্বীকার টা ভয়ের চেয়ে মহত্তর ব্যাপার—কেননা শাস্তির ভয়ে ··হ্যাঁ, বুঝেছি···আসলে···'

সমাপ্ত রেখে স্বামী উঠে দাঁড়ালেন। অস্থিরভাবে তে লাগলেন ঘরময়।

হৃদয়ের গভীরে গিয়ে ঘা দিয়েছে।

র করতে করতে হঠাৎ স্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। খ তাকালেন।

'বুঝেছি!' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, তেমনি শান্তও হয়ে এলেন হঠাৎ। সংযত স্বরে বললেন, 'অচেনা অজানা কোন মানুষের কাছে লজ্জার বাধা আসে, স্বীকার করি। বাইরের লোকের সামনে লজ্জা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক—কারণ

এই নিয়ে তারা ঘোঁট পাকাবে, নানা বদনাম রটাবে। ভাগাড়ের হদিশ পেলে শকুনি যেমন হন্যে হয়ে ওঠে, খবরের কাগজে কোন কলঙ্কের কাহিনী পড়লে ওরাও তেমনি হয়ে যায়—ওদের সামনে লজ্জা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যে-মানুষ একান্ত আপনার জন তার কাছে লজ্জার কোন মানে আমি বুঝিনে। সেখানে কেন লজ্জা এসে বাধা দেবে?'

'আচ্ছা, মনে করো,' আইরিন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, স্বামীর দৃষ্টি সে সইতে পারছে না, 'মনে করো,' নিজের থরথর গলার স্বরে নিজেই সচকিত হয়ে ওঠে, 'মনে করো, সেই আপনার জনের সাথে তার সম্পর্কটা যদি এত-বেশি ঘনিষ্ঠ হয় যে লজ্জা দেখা দেওয়াই একান্ত স্বাভাবিক?'

স্বামী যেন বজ্রাহত।

'তার মানে……তুমি…তুমি বলতে চাও'……তোতলাতে লাগলেন তিনি, সহসা কণ্ঠস্বর তাঁর খাদে নেমে এল, আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল, 'তাহলে তুমি কি বলতে চাও নিজের দোষের কথা হেলেন ওর কাছে…মানে ওদের গভর্নেসের কাছে… ফ্রাউলিন মেরীর কাছে…আরও সহজে স্বীকার করতে পারত? আমার চেয়েও…'

'আমার তো তাই মনে হয়। শুধু মনে হওয়া কেন— সত্যিই তাই। আর সকলের চেয়ে তোমাকে ও বেশি ভালোবাসে, তোমার মতামতের দাম ওর কাছে অনেক-বেশি— তাই ও অমন গোঁ ধরে ছিল। তাই তোমার সামনে নিজের

দোষ স্বীকার করতে লজ্জা পেয়েছিল। তোমাকে ভালোবাসে বলেই—সকলের চেয়ে তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসে বলেই—'

আইরিনের কথা জড়িয়ে যায়।

স্বামী ফের পায়চারি শুরু করে দিয়েছিলেন, সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'হয়ত তুমি ঠিকই বলেছ।…হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলেছ। আশ্চর্য! ভুলেও এটা একবারও আমার মনে পড়েনি!…তোমার কথা মেনে নিলাম। কিন্তু…মনে কোরো না যে ক্ষমা করতে আমি পারিনে—আমি পাষাণ!…না না আইরিন, আমার সম্পর্কে অমন খারাপ ধারণা করতে তোমায় আমি কক্ষনো দেব না। দয়াধর্ম আমার শরীরেও আছে, প্রয়োজন হলে আমিও যে সবকিছু ক্ষমা করতে পারি—'

আইরিনের দুই কান ঝাঁ ঝাঁ করে। আপনা থেকেই কি কথাগুলি ওঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে, ঝোঁকের মাথায়? না, ইচ্ছে করে উনি বলছেন এসব কথা? এ দিয়ে কিছু বলতে চাইছেন? কী বলতে চাইছেন?

আইরিন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'হ্যাঁ, আমিও ক্ষমা করতে জানি, আইরিন—অতএব, সাজা বাতিল। হেলেন মুক্ত! যাই, এক্ষুনি গিয়ে ওকে সুখবরটা দিয়ে আসি। কিগো, এবার খুশি হয়েছ তো? নাকি আরও কিছু বলার আছে? আর কী চাও, বলো?…যাক, আমিও

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কী অন্যায়ই যে করতে যাচ্ছিলাম! বুঝলে আইরিন, মানুষ যখন···মানুষ যখন···'

আইরিন ভাব দেখায় যেন স্বামী কি বলতে চাইছেন কিছুই সে আন্দাজ করতে পারছে না। নিজের অজান্তেই সে এক পা এক পা করে এগিয়ে যায় স্বামীর সামনে। তার মনের কথাগুলি ঠোঁটে এসে পড়েছে, থরথর করে কাঁপছে তার ঠোঁট দুটি অনুচ্চারিত আবেগে।

ওদিকে স্বামীও এগিয়ে আসেন একটু একটু করে। স্ত্রীর জীবনের দুর্বহ বোঝার ভারটা যেন নিজ হাতে তিনি সরিয়ে দিতে চান। উদ্ধার করতে চান অভাগিনীকে।

আইরিন চোখ তুলল, স্বামীর চোখে চোখে তাকাল— দৃষ্টি বিনিময় হল। কী আকুল আকুতি ফুটে উঠছে ওঁর নীরব দুই চোখের ভাষায়ঃ বলুক, বলুক, এই তো সময়—সব আইরিন বলে ফেলুক!

মুহূর্তে সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে আসে, স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত সাহস উবে যায়। হাত দুটি নেতিয়ে পড়ে দুপাশে।

চকিতে আইরিন ঘুরে দাঁড়াল।

'অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব!' আইরিন ভাবে, 'না না না, তা আমি কোনমতে পারব না! সে-কথা স্বীকার করতে পারব না আমি! যে-কথাগুলি বলতে পারলে শান্তিতে হৃদয় আমার ভরে যাবে, আমার মুখই যে তা উচ্চারণ করতে নারাজ।'

অন্তরের অন্তস্তল থেকে আইরিন চাইছে—অবিলম্বে অবসান হয়ে যাক এই অন্তর্দাহের। এক্ষুনি সব কিছু উনি জেনে ফেলুন—এই মুহূর্তে।

কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলার যে তার সাহস নেই !

আইরিনের এই আন্তরিক কামনাটা সফল হবার সুযোগ এসে গেল অপ্রত্যাশিত ভাবে। এত তাড়াতাড়ি যে এর হেস্তনেস্ত ঘটে যাবে, আইরিন নিজেও ভাবেনি।

সেই ব্ল্যাকমেলিংয়ের ব্যাপারটা পক্ষকাল ধরে চলার পর আইরিন বুঝল—এবার সে সামর্থ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছে।

দিন চারেক হল 'ইয়েটা'র দর্শন নেই। কিন্তু আতঙ্কটা এখন এমন মজ্জায় মজ্জায় মিশে গেছে যে, সদরে ঘণ্টাধ্বনি শোনামাত্র বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। সবসময় অধীর হয়ে থাকে—কখন আসে কখন আসে! তার এই অধীরতা ক্রমে পরিণত হয় প্রতীক্ষায়। ব্যাকুল প্রতীক্ষায়। কেননা একবার ওর দাবি মেটানো মানে অন্তত একটি সন্ধ্যার শান্তি। একটি সন্ধ্যা অন্তত ছেলেমেয়েদের নিয়ে দুদণ্ড স্বস্তিতে কাটাতে পারবে, নিশ্চিন্ত মনে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসতে পারবে।

নিচে থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল। শুনেই তাড়াতাড়ি নেমে এল আইরিন।

সামনে দাঁড়িয়ে এক আগন্তুক—কেতাদুরস্ত পোশাক-পরিহিতা এক ভদ্রমহিলা। টুপির কী বাহার!···না না, এ তো অজানা আগন্তুক নয়—ওই তো টুপির নিচে দেখা যাচ্ছে মুখখানা—অতিপরিচিত সেই ঘৃণ্য মুখচ্ছবি!

'যাক, ভাগ্যিশ দেখা হয়ে গেল!' 'স্ত্রীলোকটি বলল, 'আপনার সাথে একটা বড্ড জরুরী কথা আছে।' বলেই অনুমতির অপেক্ষা না করে আইরিনকে ঠেলে-সরিয়ে হলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর স্ট্যাণ্ডের কাছে এগিয়ে গিয়ে সযতনে রেখে দিল তার লাল রঙের ছাতাটি। নির্বিকার।

ভাবখানা এমন—যেন এই বাড়িঘরদোর ওর একেবারে নিজস্ব সম্পত্তি! নিজের বাড়িতে পা দিয়ে যেন হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচল! এমন একটি প্রাসাদোপম বাড়ির মালিকোচিত গর্বও রয়েছে সেই সঙ্গে।

পাশেই বৈঠকখানার দরজা। সেইদিকে তাকিয়ে স্ত্রীলোকটি বলল, 'কি, ওখেনে? না-কি এখেনেই?' স্বরে তার চাপা হাসি।

আতঙ্কে বোবা হয়ে গেছে আইরিন। বাধা দিতে চাইছে প্রাণপণ, শক্তি নেই।

'না না, ওখেনেই চলুন।' বৈঠকখানার দিকে হাত তুলে আবদেরে সুরে বলল স্ত্রীলোকটি, 'দু মিনিটে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আপনি চাও তো দু' সেকেণ্ডেই সেরে দেব'খন। চলুন।'

একটি কথাও না বলে শ্রীমতী ভাগনার তার অনুসরণ করে। ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দেয় দরজা।

'বেহায়া মাগীটার কী সাহস! জোর করে ও কিনা আমার বাড়িতে আমারই ঘরে এসে ঢোকে—একবার আমায় জিজ্ঞেস

করাও প্রয়োজন মনে করে না! এত সাহস ওর—কই, আগে তো কোনদিন এটা টের পাইনি।' মনে মনে আইরিন ভাবে, মুখে কিন্তু কিছু বলতে পারে না।

জেগে জেগে সে যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে।

'বাঃ সোন্দর ঘরখানা কিন্তুক!' চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্ত্রীলোকটি বসল। 'ঈজিচেয়ারটাও বেড়ে—বসে কী আরাম!···আর, আমার!' ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। 'ঘরভরা কত্ত ছবি! কী সাজানো-গুছনো!···আর, আমার! বসবার একটা চেয়ার পর্য্যন্ত নেই! সত্যি বলছি গা—ভারী সোন্দর!'

'ইয়েটা'র স্পর্ধায় আইরিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ওর কথাবার্তা শুনে কথা বলার ধরন দেখে ধৈর্যের বাঁধ তার ভেঙে যায়।

সামান্য একটা ব্ল্যাকমেলারের—একটা ক্রিমিনালের—এতখানি সাহস!

বোমার মত ফেটে পড়ে আইরিন।

'তুমি···তুমি একটা জোচ্চোর···তুমি···তুমি একটা ব্ল্যাক-মেলার···কী চাও তুমি? কোন্ সাহসে তুমি আমার বাড়িতে পা দিয়েছ? ভেবেছ এতদিন কিছু বলিনি বলে চিরকাল আমি মুখ বুজে সব সয়ে যাব, না? তোমার জুলুম আর আমি সইব না। আর একটি দিনের তরেও না। এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি—'

'আহা-হা, আস্তে! আস্তে গো ঠাকরুন আস্তে—অত

চেঁচ্যোও না, ঝি-চাকররা কোত্থেকে কে শুনে ফেলবে। তখন আবার···অবিশ্যি আমার তাতে কিছু যায় আসে না—ক্ষেতি হবে আপনারই। আমি তো দোষ করিইছি···হ্যাঁ, অন্যায় করিছি আমি। এতে যদি আমার জেলও হয়—হোক। এভাবে উপোস করে মরার চাইতে জেল অনেক ভালো। সেখেনে তবু খেয়েপরে বাঁচব। কিন্তুক···ভাগনার-গিন্নি হলেন গিয়ে মান্যিগন্যি বড়নোক মানুষের পরিবার—তেনার কি গরীবগুর্বোর মতন···হ্যাঁ বাপু, চেঁচামেচি করার আগে ভালো করে চারপাশ দেখেশুনে নাও,···দরজাটা ঠিক-ঠিক বন্ধ হয়েছ তো?···কে কোথায় আড়ি পেতে আছে কে জানে!···তা'পর আমায় যা খুশি বলুন, মারুন-ধরুন কেটে ফেলুন—রা'টি করবনি। শুধু দরজাটা—'

আকস্মিক ক্রোধে মনে সাহস জেগেছিল, সেই সাহসেই আইরিন ফুঁসে উঠেছিল—কিন্তু স্ত্রীলোকটির কথাগুলি শুনে, তার শয়তানী-মাখা নিরাসক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে উবে গেল তার সমস্ত সাহস।

শিক্ষকের কাছে পরবর্তী পাঠগ্রহণের জন্যে প্রতীক্ষারত শিশুর মত হাঁ করে সে তাকিয়ে রইল· ওর মুখের দিকে।

নিজেরই বাড়িতে নিজেরই বৈঠকখানা ঘরে আইরিন যেন আগন্তুক এক।

ভয়ে জড়সড় হয়ে সে তাকিয়ে থাকে স্ত্রীলোকটার মুখের দিকে—উৎকণ্ঠায় উদগ্রীব।

'ভণিতা বাদ দিয়ে সরাসরি কাজের কথাই পাড়ি, কি বলো ঠাকরুন? আপনি তো জানোই, দিনকাল আমার বড্ড খারাপ যাচ্ছে। কী বলব—বড় দুরবস্থা গো! ক' মাসের ঘর ভাড়া বাকি পড়েছে, তাই নিয়ে বাড়িওলা চব্বিশ ঘণ্টা খিঁচোচ্ছে। শুধু ঘর ভাড়া? দেনায় একেবারে ডুবে রইছি। দিনরাত অশান্তি। আর সয় না! তাই আপনার কাছে ছুটে এনু—চটপট আমায় এখন শ' চারেক ক্রাউন দিয়ে দাও দেখি।'

'অসম্ভব। অত টাকা আমি কোথায় পাব? তোমায় সত্যি কথাই বলি, আমার হাত প্রায় খালি হয়ে এসেছে। মাসিক হাতখরচের থেকে এর মধ্যেই তোমায় তিনশ ক্রাউন দিয়েছি। রোজ রোজ কোত্থেকে টাকা জোগাড় করব, বলতে পারো?'

'কী যে বলেন! বড়নোক মান্ষের ইস্তিরি, হাত বাড়ালেই তো আপনারা টাকা পেয়ে যান! একটুন চেষ্টা করলেই ওটা জোগাড় হয়ে যাবে'খন। ভাবো ভাবো—ভেবে দেখ ঠাকরুন—একটা না একটা উপায় ঠিক বেইরে যাবে।'

'কিন্তু, সত্যিই আমার হাত প্রায় খালি। টাকা থাকলে আমি নিশ্চয় তোমায় দিতাম। বিশ্বাস করো—দিব্যি করে বলছি—কুড়িয়ে-বাড়িয়ে বড় জোর শ'খানেক যদি পারি তো—'

'চারশ'র কমে আমার কাজ হবে না সে তো আপনাকে গোড়াতেই বলিছি।' বাধা দিয়ে স্ত্রীলোকটি বলে। আইরিনের প্রস্তাবে কানও দেয় না।

'অত টাকা নেই আমার!' হতাশায় কান্না এসে যায় আইরিনের। অসহায়ের মত সে ছটফট করতে থাকে। নতুন করে এখন আশঙ্কা জাগছে—এই বুঝি স্বামী এসে পড়লেন! নিজের বাড়িতেই বুঝি দেখা হয়ে যায় দুজনের মধ্যে! কেলেঙ্কারির তাহলে আর অবধি থাকবে না।

কান্নাজড়ানো স্বরে আইরিন বলল, 'দোহাই তোমার—বিশ্বাস করো আমার কথা। সত্যি অত টাকা নেই আমার কাছে। দোহাই—'

'আ! তাড়াতাড়ি যাও না বাপু! দেরি হলে আবার'—

'বিশ্বাস করো—'

স্ত্রীলোকটা এবার আইরিনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নেয়—আইরিনের দামটা যেন সে যাচাই করে নিচ্ছে।

'কেন—হাতের ওই আংটি? ওটা বাঁধা রাখলে চারশ কোন্ ছাড় তার চে অনেক বেশি পেয়ে যাবে। অবিশ্যি, আমি গরীবগুর্বো মানুষ, গয়নাগাটি পরা দূরে থাক, বাপের জন্মে এসব চোখেও দেখিনি—দামটামও জানিনে। তবে···শ' চারেক ক্রাউন···ওটা বাঁধা রাখলে কম করেও চারশ ক্রাউন নিয্যস হবে। ওইটেই তাহ'লে—'

'এই আংটি!' আইরিন আর্তনাদ করে উঠল।

এটা তার বিয়ের আংটি, কক্ষনো সে এটা আঙুল থেকে খোলে না। কত মধুর স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে ছোট্ট এই

আংটিটির সঙ্গে। পাথরটা অত্যন্ত পয়া, মানিয়েছেও কী চমৎকার!

এই আংটি ওকে খুলে দিতে হবে?

'এই আংটি!'

'ক্ষেতি কি? আমি তো আর বেচতে বলছিনি। বা আমি নিজেও ওটা চাইনি। বাঁধা রেখে রশিদটা আপনাকে দিয়ে দেব, তা'পর সুবিধে মত আপনি খালাস করে নেসবে—হয়ে গেল! আংটি তোমার মার যাবে নি—সে আপনি নিশ্চিন্তি থাক ঠাকরুন। আমার মত গরীবগুর্বো হাভাতে মনিষ্যি হীরেমুক্তো নিয়ে কি করব!'

'কেন তুমি এমন জুলুম করছ!' কাতরস্বরে আইরিন বলে, 'কেন আমায় এত কষ্ট দিচ্ছ! আর যে আমি সইতে পারছিনে! তোমার কি একটুও মায়াদয়া নেই? আমার মনের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ তো! আমিও তো মানুষ! দয়া করো—দোহাই—আমায় একটু দয়া করো।'

'দয়া!' মুখ বিকৃত করে স্ত্রীলোকটি বলে, 'দয়া! আমায় কে কবে দয়া করেছে? কেউ না! কোনওদিন কেউ আমায় দয়া করেনি। আমি না খেয়ে আজ মরতে বসিছি—কেউ একবার ফিরেও তাকায় না। দয়া! তোমার মত বড়নোক মান্ষের বউকে দেখে আমার দয়া হবে! কেন হবে? কোন্ দুঃখে'—

আইরিন জবাব দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সদর দরজা খোলার শব্দ কানে এল। স্বামী!

স্বামী ফিরলেন অফিস থেকে।

ভাববার অবসর নেই, কি করছে আইরিন নিজেও বুঝছে না—তাড়াতাড়ি আংটিটা খুলে দিয়ে দিল ওর হাতে।

'আহা-হা, অত ভয় পাচ্ছ কেন গা! ভয় নেই, আমি এক্ষুনি সরে পড়ছি!' স্ত্রীলোকটি অভয় দেয়। হলঘরে যে-পুরুষ মানুষটির ভারী পদশব্দ শোনা যাচ্ছে তিনি আর কেউ নন, তার জালে-আটকা-পড়া শিকারের—আইরিনের—স্বামী ওই ভদ্রলোক—সে তা টের পেয়ে গিয়েছে। তাই না ওর চোখে-মুখে সমস্ত অবয়বে ফুটে উঠেছে ভয়ের এই বিভীষিকা।

দরজা খুলে গৃহকর্তার দিকে সসম্ভ্রমে মাথা হেলিয়ে সে নমস্কার জানাল। আইরিনের স্বামী তাকে দেখেও দেখলেন না।

স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

সে চোখের আড়াল হওয়া মাত্র আইরিন সচেতন হয়ে ওঠে। প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করে নিজে থেকেই স্বামীকে বলে যে ভদ্রমহিলা একটা ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছিলেন তার কাছে।

স্বামী কিন্তু তার কথায় কান দিলেন বলে মনে হল না। নিঃশব্দে তিনি খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

খাবার টেবিলে বসে আইরিন হাতের আঙুলটির দিকে তাকাল। আংটি নেই, তার জায়গায় গোলাকার একটি দাগ। তাকালেই চোখে পড়ে। সকলেরই চোখে পড়ে যাবে।

হাতটি সে লুকিয়ে রাখে।

তবু মনে হয়, স্বামীর চোখ জোড়া যেন তার আংটিবিহীন আঙুলটির দিকেই তাকিয়ে রয়েছে নির্ণিমেষ!

স্বামীর মন ভোলাবার জন্যে সে কথা বলতে আরম্ভ করে। আবোল-তাবোল অপ্রাসঙ্গিক নানা কথা বলে যায় অনর্গল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। ছেলেমেয়েদের সাথে শুরু করে দেয় হাসিমশ্‌করা—এই সব করে চেপে রাখতে চায় উথলে-ওঠা উত্তেজনা, আশঙ্কা।

কিন্তু, সব বৃথা! কিছুতেই কিছু হয় না। কিছুতেই পরিবেশটা জমে ওঠে না। থেকে থেকে নেমে আসে স্তব্ধতা।

কেমন-যেন সুর কেটে গিয়েছে। ছোট্ট এই পরিবারটি কোনমতেই আর একাত্ম হয়ে উঠতে পারছে না।

আবার নতুন করে চেষ্টা করে আইরিন। শেষ চেষ্টা। ছেলেমেয়েদের নিয়ে পড়ে এবার। হাসির কথা বলে তাদের হাসাতে চায়—তারা হাসে না। ভাই বোনের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিতে চায়—গলায় গলায় ভাব তাদের ঘোচে না।

তবে কি সে ধরা পড়ে গেছে? এসব যে তার চেষ্টাকৃত অভিনয়—সবাই কি সেটা বুঝে গিয়েছে? নইলে কেন এমন হচ্ছে? বাচ্চা দুটোকে হাসাবার জন্যে সে যত-বেশি চেষ্টা করে, ততবেশি যেন গোঁ ধরে বসে ওরা—হাসবে না কিছুতেই। কেন?

শেষ পর্যন্ত আইরিন ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ক্লান্ত হয়ে চুপ করে রইল।

বাকি সকলেও চুপচাপ। শুধু কাঁটা-চামচের টুংটাং শব্দ। চারদিক নিস্তব্ধ।

'তোমার আংটি কোথায়?' আচমকা জিজ্ঞেস করলেন স্বামী।

অবশেষে হতে হল অনিবার্য সেই প্রশ্নের মুখোমুখি! তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে। আরো একবার মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। শেষবার।

'আংটি গেছে, সেই সাথে আমিও গিয়েছি'—মনে মনে আইরিন বলল। মুখে বলল, 'আংটিটা? পালিশ করতে দিয়েছি। বড্ড ময়লা জমে গিয়েছিল!' যুৎসই মিথ্যেটা বলতে পেরে উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'হু'একদিনের মধ্যেই গিয়ে নিয়ে আসব।'

ঝোঁকের মাথায় তো বলল—হু'একদিনের মধ্যেই। তার মানে—পরশু পর্যন্ত সময়। পরশুর মধ্যেই যে-করে-হোক ফিরিয়ে ওটা আনতেই হবে। যে-করেই হোক!

এর মধ্যে উপায় কি একটা বার করা যাবে না ভেবেচিন্তে? নিশ্চয় যাবে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আইরিন—শরীর মন হুই-ই এখন হালকা লাগছে অনেকখানি। মন খুশি হয়ে উঠেছে—যাক, এতক্ষণে একটা হেস্তনেস্ত হল। পরশু পর্যন্ত তার মেয়াদ। আপাতত হুদিনের জন্যে তো নিশ্চিন্ত—তারপর যা হয় হবে। সেকথা ভেবে এখন সে আত্মিক বল পাচ্ছে। এই হুদিন ধরে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে।

হয় জীবনের, নয় মৃত্যুর প্রস্তুতি।

হয় বাঁচবে, নয় বরণ করে নেবে মৃত্যুকে।

এই তার বিধিলিপি !

কথাটা মনে হওয়া মাত্র আইরিনের মন থেকে অবসান হয়ে গেল সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের। এতদিন ধরে যে স্নায়বিক উত্তেজনায় ভেতরে ভেতরে সে উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, আর সেটার অস্তিত্ব রইল না। মন শান্ত, সংযত হয়ে এল। মন থেকে মুছে গেল সমস্ত ভয়, ভাবনা—কেন যে, আইরিনও তা বুঝতে পারে না।

নতুন একটা শক্তি জেগে উঠেছে অন্তর থেকে, তৃতীয় এক নয়নের যেন অধিকারিণী হয়েছে—নিজের হাতে নিজের জীবনকে এবার সে নিয়ন্ত্রিত করবে। নিজের খুশিমত, প্রয়োজনমত।

আপন অস্তিত্বের মূল্য যাচাই করে দেখে আইরিন। দেখে—এখনো তার মূল্য রয়েছে, তবে সেটা বজায় রাখতে হলে আরো সচেতন হতে হবে। সম্প্রতি যে-অভিজ্ঞতা হল, সেটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। আত্মরক্ষার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। তা যদি পারে, তবেই তার পক্ষে বাঁচা সার্থক।

নইলে—স্বামী যদি তাকে পরিত্যাগ করেন, তা হলে ব্যাভিচারিণীর মত অসীম কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে—

না না, ওভাবে বাঁচতে আইরিন পারবে না—কক্ষনো পারবে না। অত সইবার তার শক্তি নেই। সে-জীবনের বোঝা সে বয়ে বেড়াতে পারবে না।

আবার, গত ক' সপ্তাহ ধরে যে লুকোচুরি খেলা খেলে আসছে, সেটা চালিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। আর তার সামর্থ্য নেই।

বড় ক্লান্ত আইরিন, বড় অবসন্ন।

স্বামী, ছেলেমেয়ে, গভর্নেস, এমন-কি ঝি-চাকরদের পর্যন্ত— সকলের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, সকলেই অস্বস্তি বোধ করছে।

আর, সে নিজে? সে নিজেও কি নিজেকে সন্দেহ করে না? এক ফোঁটা আত্মবিশ্বাসও কি আর অবশিষ্ট রয়েছে?

পালিয়ে যাবে?

সে-প্রশ্নই ওঠে না। যেখানে গিয়েই আত্মগোপন করুক— ওই 'ইয়েটা' গিয়ে ঠিক হাজির হবে।

এক উপায় ছিল, স্বামীর কাছে সব স্বীকার করা।

কিন্তু, তাও এখন অসম্ভব। বড় দেরি হয়ে গেছে।

শুধু একটি পথ আজ খোলা রয়েছে তার সামনে—যে-পথে একবার গেলে কোন পথিক আর ফিরে আসে না!

পরের দিন আইরিন সন্দেহজনক সমস্ত চিঠিপত্র পুড়িয়ে ফেলে ঘরদোর গোছগাছ করে রাখল। এড়িয়ে এড়িয়ে চলল ছেলেমেয়েদের—আর সে মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়তে চায় না। যে-সব জিনিসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক সুখের স্মৃতি সেগুলির দিকে ফিরেও চাইল না। পাছে ওগুলি তার চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়—পাছে ও-সবের মোহে সে বিচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রতিজ্ঞা থেকে।

বাঁধন এবার কাটতে হবে।

ঘরসংসার ঠিকঠাক করে আইরিন বাড়ি থেকে বেরোয়।

কোথায় যাবে ঠিকঠিকানা নেই, অনির্দেশ যাত্রায় ঘুরতে লাগল পথে পথে। মনের যেন চেতনা বলতে কিছু নেই। ক্লান্তিতে মনটা যেন মরে গিয়েছে।

পুরো দুটি ঘণ্টা পথে পথে ঘুরে বেড়াল। আনন্দ বা প্রয়োজনের প্রেরণায় নয়, দুর্বোধ্য একটা কর্তব্যের তাগিদে। যার দেখা পাবার গোপন আশায় বেরিয়েছিল, দেখা তার পেল না। এগিয়ে এসে তাকে সম্ভাষণ জানাবার জন্যে আশেপাশে কোথাও নেই সে।

না থাক, সেজন্যে কোন আপসোসও নেই। এই হতাশা তার মনে রেখাপাত করল না। চারপাশে যেন প্রেতের সঞ্চরণ। মানুষের দিকে তাকালে মরা মানুষের মুখের কথা মনে পড়ে।

জীবনের স্পন্দন নেই কোথাও। সব আজ মরে গিয়েছে, চিরদিনের মত তলিয়ে গিয়েছে বিস্মৃতির অতলে। এদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আইরিনের আজ নেই আর।

হঠাৎ আতঙ্কে সে শিউরে উঠল—স্বামী! স্বামীর সাথেই কি চোখাচোখি হল এইমাত্র?

যাকে দেখে সে আঁৎকে উঠেছিল দেহটা তার চোখের পলকে আড়াল পড়ে গিয়েছে একটা গাড়ির আড়ালে।

নিজের মনকে আইরিন প্রবোধ দেয়—না না, ও লোকটা তার স্বামী কখনো নয়। তিনি তো এখন আদালতে নথিপত্র নিয়ে ব্যস্ত। এখন কি তাঁর রাস্তায় রাস্তায় ঘোরবার সময়!

হাঁটতে হাঁটতে সময়ের দিকে খেয়াল ছিল না। আইরিন যখন বাসায় খেতে এল, বেশ দেরি হয়ে গেছে।

তবে কিনা, দেরি শুধু তার একারই হয়নি, স্বামীও আজ দেরি করে এলেন। সে ফেরার মিনিট কয়েক পরে তিনি ফিরলেন। মনটা তাঁর কেমন-যেন বিভ্রান্ত বলে মনে হল।

কতক্ষণে রাত হবে—মনে মনে আইরিন হিশেব করে। ঈশ! এখনো অনেক দেরি—এখনো অনেকগুলি ঘণ্টার ব্যবধান!

অথচ, বিদায় নিতে লাগবে মাত্র কয়েকটি মিনিট—ভাবতেও বিস্ময়! এত সব আদরের সামগ্রী ছড়ানো চারপাশে—কিন্তু মহাপ্রস্থানের পথের পথিকের কিছুই সাথে করে নেওয়া চলবে না! কী দাম তবে এসবের?

ভাবতে ভাবতে ঘুমঘুম পায়। যন্ত্রচালিতের মত আইরিন উঠে দাঁড়ায়। বাড়ি থেকে বেরোয়। আবার হাঁটতে শুরু করে।

যন্ত্রচালিতের মত হেটে চলে।

মাথাটা একেবারে ফাঁপা হয়ে গিয়েছে। কোনরকম ভাবনা চিন্তা নেই। নজর নেই আশেপাশের দিকে—অন্ধের মত এগোয় আইরিন।

রাস্তা পেরোতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল একটুর জন্যে। ড্রাইভার যা-তা বলে উঠল। আইরিনের কানেও যায় না। নির্বিকার সে এগিয়ে চলে। কী ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল—মনে তার কোন বিকার নেই। যদি ঘটত দুর্ঘটনা, কী এমন হত? কিছুই না।

আপনা থেকেই সমাধান হয়ে যেত সব সমস্যার—তার বিনা চেষ্টাতেই— স-ব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত!

রাস্তা দিয়ে হেঁটে আইরিন চলে, স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে চলে। জানে না কোথায় এই চলার শেষ, জানতে চায়ও না। আর-কিছু তাকে ভাবতে হচ্ছে না, ভাবনার পাট চুকে গিয়েছে।

হঠাৎ আইরিন সচেতন হয়ে তাকাল চারপাশে—একী! আনমনে ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে তার প্রেমিকের বাসার কাছে! আশ্চর্য যোগাযোগ! একি তবে কিছুর ইঙ্গিত? কিসের ইঙ্গিত?

হয়ত কার্ল তাকে সাহায্য করবে। অন্তত ব্ল্যাকমেলারের

ঠিকানাটা ও নিশ্চয় জানে। ভাবতেই মন আশার আভাসে খুশি হয়ে ওঠে। আগে কেন এটা তার মনে পড়েনি? তাহলে তো কবে এর একটা নিষ্পত্তি হয়ে যেত। প্রথমেই কেন সে কার্লকে সব খুলে বলে নি!

কার্লের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আইরিন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মনে মনে খুশি হওয়ায় শারীরিক ক্লান্তিও উবে যায়। এতক্ষণ গা-হাত-পা ভার-ভার লাগছিল, আর এখন সেটা বোধ করছে না। মনের বিষণ্ণতা ধুয়েমুছে গেছে আশার জোয়ারে—ফিরে এসেছে স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি।

আইরিন ঠিক করল—ওই ইয়েটার বাসায় তাকে নিয়ে যাবার জন্যে কার্লকে সে পেড়াপীড়ি করবে। যে-করেই হোক কার্লকে সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে ওর ওখানে, আজই এই ব্যাপারটার ইতি করে ফেলবে।

কার্লকে দিয়ে চাপ দেবে ওর ওপর। কার্লের সাহায্যে ওর এই ব্ল্যাকমেলিং করাটাকে চিরদিনের জন্যে বন্ধ করতে হবে।···হয়ত মোটা রকম ঘুষ পেয়ে গেলে ইয়েটা রাজি হয়ে যাবে শহর ছেড়ে চলে যেতে।···

কার্লের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্যে আইরিনের এখন বড় আপসোস জাগে। কিন্তু···করুক সে যতই খারাপ ব্যবহার—ও কি তাই বলে এখন মুখ ফিরিয়ে থাকবে? না, না, তা কি ও কখনো পারে? ও তেমন ছেলেই নয়। নিশ্চয় কার্ল তাকে সাহায্য করবে—আইরিনের ভাতে একটুও সন্দেহ নেই।

পরিত্রাণের এমন সহজ আর স্বাভাবিক উপায়টি কিনা তার মনে পড়ে গেল এখন—একেবারে শেষ মুহূর্তে !

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে আইরিন ওপরে উঠে এল। ইলেকট্রিক বিলের বোতাম টিপে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

কেউ এসে দরজা খুলল না।

কিন্তু, ভেতরে লোক রয়েছে সন্দেহ নেই। পা টিপে টিপে চলাফেরার অস্পষ্ট শব্দও শোনা যাচ্ছে।

আবার বোতামে চাপ দিল আইরিন।

তবু খুলল না দরজা। শুধু দরজার আড়ালে শোনা গেল মৃদু একটা খসখসানি।

আইরিন এবার অধৈর্য হয়ে ওঠে। জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত এর সাথে, নিষ্ক্রিয়ভাবে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়? বোতামটা টিপে ধরে রইল—শুরু হল একটানা ঘণ্টাধ্বনি—ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং·····

শেষ পর্যন্ত খিল খুলল, একটুখানি ফাঁক হল দরজার পাট।

'আমি ! আমি এসেছি—' ফিশ ফিশ করে আইরিন বলল, 'কখন থেকে—'

দরজা খুলে ফেলল কার্ল।

'তুমি ! ফ্রাউ ভাগনার ! আমি···আমি···তুমি যে আসবে ···আমি ভাবতেও পারিনি।···আমার এই বেশবাসের জন্যে মাপ চাইছি—দাঁড়াও···এক্ষুনি আসছি···।'

কার্ল আমতা আমতা করে। আইরিনকে দেখে সে

বেকুব হয়ে গিয়েছে। গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি। এ বেশে কখনো ওর মুখোমুখি হওয়া যায়!

'তোমার সাথে আমার একটা জরুরী কথা আছে—ভীষণ জরুরী। এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না। শোন, আমার একটা উপকার তোমায় করতে হবে, কার্ল।' এক নিশ্বাসে আইরিন বলে, 'আঃ, দরজা থেকে সরো না—আমায় ঢুকতে দাও। ভয় নেই, তোমার বেশি সময় আমি নষ্ট করব না। স-রো—'

'কিন্তু···ইয়ে···মানে···আমি এখন বড্ড ব্যস্ত! এখন তোমার সাথে কথা বলা···'

'বাজে বকো না! আমার কথা আগে শুনতেই হবে। বলছি বেশিক্ষণ আমি থাকব না। তা ছাড়া···তা ছাড়া···এর জন্যে তুমিই তো দায়ী। আমায় এখন সাহায্য করা তোমার কর্তব্য। নিজের কর্তব্য কেন তুমি করবে না?···আমার আংটিটা তোমায় ফিরিয়ে এনে দিতে হবে, কার্ল···হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার আংটি! অমন হাঁ করে কি দেখছ? বেশ, তা না পারো—ওর ঠিকানাটা অন্তত আমায় দাও।···দিনরাত আমার পেছনে ফেউয়ের মত লেগে ছিল, আর এখন—এখন ওকেই যখন আমি খুঁজছি—কোথাও পাচ্ছিনে। পাব কি করে, ঠিকানা জানলে তো! ওর ঠিকানাটা—বলি কানে যাচ্ছে আমার কথাগুলো—ওর ঠিকানাটা আমায় দাও। আমায় তুমি সাহায্য করো, কার্ল।'

কার্ল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। বিস্ময়ে বিমূঢ়।

'চমৎকার!' তিক্তস্বরে আইরিন বলল, 'এমন ভাব দেখাচ্ছ, আমি কার কথা বলছি তুমি যেন বুঝতেও পারছ না!...ওগো, তোমার সেই প্রাণেশ্বরী—আমার আগে যিনি এসেছিলেন। এবার চিনেছ?...এখান থেকে বেরোবার সময় একদিন আমায় হাতেনাতে ধরে ফেলে, তারপর থেকে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে...বেপরোয়া ব্ল্যাকমেলিং চালিয়ে যাচ্ছে—আজ আমি ঠিক করেছি, এর একটা হেস্তনেস্ত করবই করব। ওর জন্যে জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে।...আংটিটা আমার ফেরৎ চাই-ই চাই। বড় জোর...আজ সন্ধ্যের মধ্যে। লক্ষ্মীটি, কার্ল, আমায় তুমি সাহায্য করো...ওর ঠিকানাটা'...

'কিন্তু—'

'ফের কিন্তু! আমার কথা রাখবে কি রাখবে না—স্পষ্ট জানিয়ে দাও। অত কিন্তু-কিন্তু আমি শুনতে চাইনে!'

'কিন্তু—বিশ্বাস করো—কার কথা তুমি বলছ আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছিনে। কোনদিন কোন ব্ল্যাকমেলারের সাথে—'

'তুমি তাকে চেনো না, কেমন? তার মানে, কর গুণে সে সবকিছু টের পেয়ে গিয়েছিল, তাই না? আপনা থেকেই আমার নামধাম জেনে ফেলেছিল—এই তুমি বলতে চাও? বোধ হয় তোমার মতে—ওকে ব্ল্যাকমেলার ভেবেও আমি মহা ভুল করেছি? এ সব স্বপ্ন! সব মায়া!—কি বলো?'

সশব্দে হেসে উঠল আইরিন। হিংস্র হাসি।

কার্ল জড়সড় হয়ে পড়ল। ধক ধক করছে আইরিনের দুই চোখের মণি, তাই দেখে একবার তার মনে হয়—হয়ত ওর কথায় সত্যতা কিছু রয়েছে।

কিন্তু ব্যাপারটা যে কী সেটা কোনমতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

কার্ল উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। বলে, 'শান্ত হও, আইরিন, দয়া করে শান্ত হও। কেন অত উত্তেজিত হচ্ছ! নিশ্চয় তুমি ভুল করেছ। নিশ্চয় কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছে।··· কিন্তু আমি···না না···বিশ্বাস করো, সত্যি আমি কিছু জানিনে—তোমার কথা সত্যি, আমি বুঝতে পারছিনে—বিশ্বাস করো—কার কথা যে তুমি বলছ···এ বাসায় আসার পর থেকে আমি মাত্র দুজনের সাথে···'

'তাহলে কি আমি এই ধরে নেব যে আমায় সাহায্য করতে তুমি রাজি নও?'

'না না—সে কী! তোমায় যে-কোনরকম সাহায্য করতে পারলে আমি বলে কৃতার্থ—'

'বেশ, তাহলে চলো,—আমরা ওর বাসায় যাই।'

'কিন্তু—কার 'বাসায়'?' থতমত খেয়ে গেল কার্ল। তার মনে হল, অতিপরিচিত সেই আইরিনের সঙ্গে সে যেন কথা বলছে না—পড়ে গিয়েছে এক পাগলের হাতে।

'তার বাসায়!' গলায় জোর দিয়ে বলল আইরিন। 'তুমি যাবে কি যাবে না তাই বলো?'

'নিশ্চয় যাব—একশবার যাব। তোমাকে খুশি করবার জন্যে—'

'তবে কেন মিছে দেরি করছ! কেন বুঝছ না যে এ আমার জীবন-মরণের প্রশ্ন!'

শুনে কোনমতে কার্ল হাসি সম্বরণ করল।

মোলায়েম স্বরে বলল, 'কিন্তু···মানে···ঠিক এখনই আমার পক্ষে বাড়ি থেকে বেরুনো···যাকে বলে—অসম্ভব। একটু ব্যস্ত রয়েছি···এইমাত্র একজনকে গান শেখাতে আরম্ভ—'

'গান শেখাচ্ছ? গেঞ্জি পরে এই বেশে তুমি গান শেখাচ্ছ? ধাপ্পা দেবার আর লোক পেলে না!' বলতে বলতে উত্তেজনার মাথায় কার্লকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে আইরিন ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

'মনে হয় ওটাও এখানে আছে—তোমরা দুজনে মিলে আমায় নিয়ে খেলাচ্ছ। দুজনের মধ্যে সাঁট রয়েছে। ও নিশ্চয় তোমায় মুনাফার ভাগ দেয়, না? কিন্তু আমিও আজ ছাড়ছিনে—এর শেষ দেখে তবে যাব। আর আমি কারো ভয় করিনে, যা থাকে বরাতে—'

কার্ল ধরে রাখবার চেষ্টা করল, এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে হনহন করে আইরিন এগিয়ে চলল শোবার ঘরের দিকে।

তাকে দেখেই চকিতে একজন সরে যায়। এতক্ষণ আড়ি পেতে শুনছিল। মেয়েটির দিকে তাকাল আইরিন, বিস্রস্ত বেশবাস—কিন্তু যে-স্ত্রীলোকটিকে সে খুঁজছে এ সে নয়।

'মাপ করবেন!' বলেই তাড়াতাড়ি সে পিছন ফেরে, 'আমি দুঃখিত! অত্যন্ত দুঃখিত!…কাল আপনাকে সব গুছিয়ে বলব। সত্যি বলতে-কি…আমার সব কিছু যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে…কিছুই আমি বুঝতে পারছিনে…'

শেষের কথাগুলি বলে কার্লকে উদ্দেশ করে। এমনভাবে বলে যেন কার্ল অপরিচিত এক আগন্তুক মাত্র। তার চালচলন দেখে কে বলবে যে কদিন আগে সে ওর প্রিয়তমা ছিল, ওকে প্রিয়তম বলে গ্রহণ করেছিল!

মাথা ঘুরছে। হিশেবে কোথায় যেন মস্তবড একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। কিছু ভাববার শক্তি নেই, কোনদিকে তাকাবার সামর্থ্যটুকুও না।

চোখ বুজে আইরিন নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। তার মনে হচ্ছে, চরম বিচার তার হয়ে গেল। তার প্রতি হয়েছে ফাঁসির আদেশ।

পথ অন্ধকার।

পথের কোথাও কি সে লুকিয়ে রয়েছে? তার মুক্তির দূত কি পারে না কোন অন্ধকার কোণে লুকিয়ে থাকতে?

যদি থাকত, প্রার্থনায় তার সামনে নতজানু হয়ে বসত আইরিন, করজোড়ে ভিক্ষা চাইত তার কাছে। যদি মুক্তি পেত—মাসখানেক কি মাসদুয়েকের জন্যে অন্তত!…চলে যেত এই শহর ছেড়ে অনেক…অনেক দূরে…গ্রামে…চারদিকে যার চোখ-জুড়নো শ্যামল প্রান্তর…মনোরম দ্রাক্ষাকুঞ্জ…ওই ব্ল্যাক-মেলারের হাত এড়িয়ে সেখানে সে পরম শান্তিতে--

হঠাৎ আইরিন সচকিত চোখে সামনে তাকাল। মনে হল, রাস্তার পাশে—ওই দরজাটার আড়াল থেকে—কে যেন উঁকি মারল এই মাত্র।

তাড়াতাড়ি সে এগিয়ে যায়…কিন্তু লোকটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

মুহূর্তের জন্যে আইরিনের মনে হয়—আর কেউ নয়, তার স্বামী। তার স্বামীই ছিলেন দরজার আড়ালে।

এখন, এই অবস্থায়, যদি দেখা হয়ে যেত তাঁর সাথে!… আইরিন দাঁড়াল…ভালো করে তাকাল সেইদিকে…অন্ধকার। কেউ নেই।

হাঁটতে হাঁটতে অদ্ভুত একটা অনুভূতি জেগে ওঠে তার

মনে। কেবলি মনে হয়, কেউ যেন তাকে অনুসরণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফেরে···জনমানবের চিহ্নও চোখে পড়ে না। কী যে অস্বস্তি!

ওষুধের দোকান।

আইরিন দোকানে ঢুকল। একটা প্রেসক্রপশন এগিয়ে দিল কাউণ্টারের দিকে।

দোকানে পা দিয়েই সে সচেতন হয়ে ওঠে এখানকার বিচিত্র পরিবেশ সম্পর্কে···ওষুধ ওজন করার ছোট্ট মেশিন···সার সার ওষুধের শিশি-বোতল···লাতিন হরফে লেখা লেবেল প্রত্যেকটির গায়ে···দেয়ালে একটা ঘড়ি···অবিরাম তার টিকটিক ধ্বনি··· ওষুধের উগ্র-ঝাঁঝালো গন্ধ···।

কত পরিচিত আইরিন এই গন্ধের সাথে! কত প্রিয় এই গন্ধটা তার! মনে পড়ে ছেলেবেলাকার কথা—ওষুধ আনবার দরকার হলে কত কাকুতি-মিনতি করে মা'র কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিত। প্রেসক্রপশন হাতে নিয়েই ছুটত দোকানের দিকে। ওষুধের দোকানের এই উগ্র-ঝাঁঝালো গন্ধটা বরাবর তার বড় ভালো লাগে, মনে যেন কেমন নেশা ধরায়। জানালায় জানালায় রঙ-বেরঙের গ্লোব সাজানো—কী সুন্দর! তাই না মা'র কাছে—

মার কথা মনে পড়ে যায়—তাঁর কাছ থেকে তো বিদায় নেওয়া হয়নি! বুড়ি যখন সব শুনবে—সে যে কী ভয়ঙ্কর আঘাত···মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে যায় আইরিনের। বুড়িমা'র

মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে···কিন্তু··কি লাভ আর সেকথা ভেবে—কম্পাউণ্ডার নীলরঙের একটা শিশিতে তরল পদার্থটা ঢালছে···মৃত্যু···ছোট্ট একটি শিশিতে···শিরায় শিরায় বয়ে যাবে ওই তরল গরল···।

আইরিনের বুক হিম হয়ে এল।

নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল—লোকটা আঙুলের চাপ দিয়ে দিয়ে ছিপি বন্ধ করছে—মোহমুগ্ধের মত সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল···এবার রঙিন একটা লেবেল শিশির সঙ্গে লাগিয়ে দিচ্ছে—'বিষ'। কাগজ দিয়ে ভালো করে মুড়ল শিশিটা···।

অদূর ভবিষ্যতের কথা মনে করে সর্বাঙ্গ তার অবশ হয়ে যায়।

'ছু ক্রাউন।' কম্পাউণ্ডার বলল।

আইরিন যেন স্বপ্নের ঘোর থেকে চমকে জেগে ওঠে। ফ্যালফ্যাল করে তাকায় চারপাশে। ব্যাগ খোলে যন্ত্রের মত—

আর, হঠাৎ কে যেন তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে ওষুধের দামটা ছুঁড়ে দিল কাউণ্টারে—তার ঝনাৎকার কানে এল আইরিনের। শিশিটা নেবার জন্যে এগিয়ে গেল একখানা হাত।

চকিতে আইরিন ঘুরে দাঁড়ায়—স্বামী!

স্বামী সামনে দাঁড়িয়ে। চাপা ছুই ঠোঁট, শক্ত চোয়াল—কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আইরিনের মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে, কাউন্টারে হেলান দিয়ে কোনমতে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখে।

স্বামী তবে তাকে এতক্ষণ ধরে অনুসরণ করছিলেন? হঠাৎ মনে হল, সেই দরজার আড়ালে স্বামীকেই তাহলে দেখেছিল!

'এসো!' নিষ্প্রাণ স্বরে স্বামী বললেন।

অবাক হয়ে আইরিন ছাখে—কী বাধ্যই না সে এখন হয়ে গিয়েছে—বিনা প্রতিবাদে শিরোধার্য করে নিল স্বামীর আদেশ! কি করছে হুঁশ নেই, আপনা থেকেই স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াল।

এগিয়ে চলল দুজনে।

কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না।

স্বামী এখনো শিশিটা হাতে করে রয়েছেন।

কপাল থেকে ঘাম মোছবার জন্যে একবার তিনি দাঁড়ালেন, আইরিনও দাঁড়িয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে—নিজেরই অজান্তে। স্বামীর দিকে এখনো সে চোখ তুলে চাইতে পারছেনা।

কথা নেই কারো মুখে। তাদের ঘিরে রয়েছে পথের গুঞ্জন, তাদের চারপাশে জনতার প্রবাহ।

বাড়ির সামনে পৌঁছে স্বামী একপাশে সরে দাঁড়ালেন, আইরিনকে আগে ঢোকার পথ করে দিলেন। কিন্তু পাশ থেকে তিনি সরে যাওয়া মাত্র আইরিন যেন নিরবলম্ব হয়ে পড়ল, থরথর করে কাঁপতে লাগল। স্বামী তার একটা হাত জড়িয়ে

ধরলেন। স্বামীর স্পর্শে সে শিউরে উঠল—তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে। এগিয়ে চলল মাতালের মত—টলতে টলতে।

নিজের ঘরে এল। স্বামীও এলেন পিছন পিছন।

ঘর অন্ধকার।

এখনো মুখ ফুটে কেউ একটি কথাও বলেনি।

স্বামী শিশির মোড়কটা ছিঁড়ে ভেতরের পদার্থ টুকু ফেলে দিলেন। তারপর খালি শিশিটা ছুঁড়ে ফেললেন এক কোণায়।

ঝনঝন শব্দে সেটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল—আবার আইরিন শিউরে উঠল।

এখনো দুজনে মৌনমূক।

অবশেষে স্বামীই এগিয়ে এলেন, কাছে এসে দাঁড়ালেন—একেবারে গায়ে গায়ে।

তাঁর ভারী শ্বাসপ্রশ্বাসের ছোঁয়া লাগছে আইরিনের মুখের ওপর।

শক্ত মুঠোয় তার হাতখানা স্বামী ধরে রয়েছেন।

এই বুঝি ঘটে বিস্ফোরণ! দুরুদুরু বুকে সে ঝড়ের প্রতীক্ষা করে।

কিন্তু, স্বামী কিছুই বললেন না।

হঠাৎ আইরিনের খেয়াল হয়—কই, ওঁকে সে যত ভয়ঙ্কর ভেবেছিল দেখে তো তা এখন মনে হচ্ছে না। বরং আগের চেয়ে অনেক দয়ালু, অনেক সহৃদয়—

'আইরিন, আর কতদিন এভাবে আমরা পরস্পরকে কষ্ট দেব! ওগো, আর কতকাল—'

গত কয়েক সপ্তাহের সমস্ত দুঃখ সমস্ত বেদনা যেন হঠাৎ একসাথে উথলে ওঠে। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে আইরিন। টলে পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি স্বামী জড়িয়ে ধরলেন।

'আইরিন!' মমতামাখানো মধুর স্বরে স্বামী ডাকলেন। 'আইরিন! আইরিন!'

বারবার তার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। গলার স্বর কোমল থেকে কোমলতর হয় এল, নিবিড় হয়ে উঠল আন্তরিকতায়। সহানুভূতির ছোঁয়ায় তিনি সান্ত্বনা দিতে চান আইরিনকে—ভুলিয়ে দিতে চান আইরিনের এই অসহ অন্তর্দাহ।

তবু স্বামীর ডাকে সে সাড়া দিতে পারেনা—ফুঁপিয়ে ওঠে। কেবলি ফোঁপাতে থাকে। দুঃসহ যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে—অবিরাম ফুঁপিয়ে চলে। দম্‌-আটকানো এই কান্নায় বুকটি বুঝি তার চৌচির হয়ে যায়।

স্বামী তাকে কোলে করে এনে সোফায় শুইয়ে দিলেন। মাথার তলায় বালিশ গুঁজে দিলেন, কম্বল দিয়ে ভালো করে সারা দেহটি ঢেকে দিলেন। তবু, ফোঁপানি তার থামে না। সেই সাথে শীতার্তের মত কাঁপছে তাঁর সর্বশরীর—যেন ঝড় বয়ে চলেছে শিরায় শিরায়।

স্বামী হাতখানি মুঠো করে ধরে রইলেন, গলায় স্নেহচুম্বন এঁকে দিলেন, কপোলে চুমো খেলেন।

দুই গাল দিয়ে আইরিনের নেমে আসছে অবিরল অশ্রুধারা, দপদপ করছে রগদুটি।

এবার স্বামী উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন।

স্ত্রীর পাশে নতজানু হয়ে বসে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিশফিশ করে বললেন, 'আইরিন, রীনা···আর কেন কাঁদছ সোনা! সব এখন চুকবুকে গিয়েছে। আর কাঁদে না—ছিঃ! ওগো, আর তোমার কোন ভয় নেই—আর সে কখনো আসবে না···'

আইরিনের দেহটা আবার থরথরিয়ে উঠল। স্বামী দৃঢ়ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। স্ত্রীর এই বুকভাঙা বোবা-কান্নায় নিজেও এখন বড় অস্বস্তি বোধ করছেন। নিজেকে তাঁর এখন খুনী বলে মনে হচ্ছে।

আবার আইরিনকে চুমো খেলেন, আবার চুমোয় চুমোয় মুখখানি তার ছেয়ে দিলেন।

'না গো না—সে আর কোনওদিনও আসবে না।' আবেগ-মথিত স্বরে বলতে লাগলেন, 'আমি কথা দিচ্ছি—আর কক্ষনো সে তোমায় জ্বালাতন করবেনা। তুমি এত ভয় পেয়ে যাবে, কি করে বুঝব, ব আমি শুধু তোমার কর্তব্যের কথাটা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম আইরিন, স্ত্রী হিশেবে খোকাখুকুর মা হিশেবে তোমার যে পবিত্র দায়িত্ব রয়েছে···তোমায় শুধু আমি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম—তোমার আপন সংসারে, তোমার আপনজনদের মাঝখানে তোমায় শুধু আমি ফিরিয়ে

আনতে চেয়েছিলাম···ওর কাছ থেকে সরিয়ে···। সব কথা যখন আমার কানে এল, তুমিই বলো, এছাড়া আর কী আমি করতে পারতাম? মুখ ফুটে তোমায় কিছু বলতে পারিনে, আবার চোখ বুজে থাকাও অসম্ভব। কতবার ভেবেছি—নিজের ভুল তুমি নিজেই একদিন বুঝবে, আশা করেছি—নিজে থেকেই ফিরে আসবে। হায়রে! নিজে থেকে ভুল তুমি বুঝলে না, নিজে থেকে ফিরে তুমি এলে না! তাই না বাধ্য হয়ে এই পথ আমায় বেছে নিতে হল। ভয় দেখিয়ে তোমায় ফিরিয়ে আনবার জন্যে ওই স্ত্রীলোকটিকে···ও-ও বড় দুঃখী, আইরিন! ও-ও বড় অভাগিনী! আগে অভিনেত্রী ছিল···এখন পেট পুরে খেতেও পায় না···! কিন্তু এখন দেখছি, জোর করা আমার অন্যায় হয়ে গেছে।···বিশ্বাস করো, ইচ্ছে করে তোমায় ব্যথা দিতে আমি চাইনি। আমি শুধু তোমার ভুলটুকু বুঝিয়ে দিতে, তোমায় ফিরিয়ে আনতে···আভাসে-ইঙ্গিতে বারবার কি সেটা তোমায় জানাইনি? ঘুরিয়ে কতবার তো বলেছি—সব আমি ভুলে যেতে রাজি, ওগো, তুমি শুধু ফিরে এসো। তবু আমার মনের কথা তুমি বুঝতে পারলে না। বিশ্বাস করো···শেষ পর্যন্ত তুমি যে ওই চরম পথ বেছে নেবে, কল্পনাও করিনি। বিশ্বাস করো···এ আমি ভুলেও চাইনি। গত ক'দিন আমিই কি কম কষ্ট পেয়েছি! দিনের পর দিন···না, নিজের কথা ভাবিনে—শুধু ওদের···আমাদের খোকাখুকুর মুখের দিকে তাকিয়ে, ওদের ভবিষ্যত ভেবেই তোমায়

আমি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম : যাক···এখন সব শেষ হয়ে গিয়েছে। আবার সব আগের মত—'

অনেক দূর থেকে—অসীম শূন্য থেকে—যেন ভেসে আসছে স্বামীর কথাগুলি—ভালো করে আইরিন সব শুনতেও পাচ্ছেনা। মনে তার শুরু হয়ে গেছে ঝড়ের মাতন, কোনরকম অনুভূতি তার নেই আর। আবছা আবছা মনে হয়—একজন তাকে আদর করছে, সোহাগ জানাচ্ছে, তার চোখের জলে গাল দুটি তার ভেসে যাচ্ছে।

আর, হৃদয়ের কোন্ গভীর গহন থেকে উঠে আসছে এক রহস্যময় মর্মরধ্বনি।

এরপরের কথা কিছু তার মনে পড়ে না। শুধু বারেকের জন্যে মনে হয়, কে যেন তার পোশাক-আবাক আস্তে আস্তে খুলে নিচ্ছে। চোখ মেলে তাকায়—স্বামী ঝুঁকে পড়েছেন—কী ব্যাকুলতা তার চোখে মুখে!

তারপর, আবার নেমে আসে অন্ধকারের নিকষকালো যবনিকা। ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায় সমস্ত চেতনা—সর্বসন্তাপহারিণী নিদ্রার কোলে নিজেকে আইরিন নিঃশেষে সঁপে দেয়।

আইরিনের যখন ঘুম ভাঙল, বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। জানালা দিয়ে নতুন দিনের আলো আসছে, তার মনেও

জ্বলে উঠেছে একটি আলোর প্রদীপ—প্রশান্তির শিখা—ঝড়-শেষের প্রশান্তি।

অতীতের কথা আইরিন মনে করতে চায়—কিন্তু কুয়াশাচ্ছন্ন মনের আকাশ।

সব যেন স্বপ্ন! স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে দিয়ে নিরবয়ব তার দেহটি যেন ভেসে চলেছিল উধাও শূন্যে, মাটির পৃথিবীতে পা দেওয়ার মত সাথে সাথে ভেঙে গিয়েছে সেই স্বপ্নঘোর।

এ কি? এই তো সেই আংটি!···

এবার আইরিন পুরোপুরি সচেতন হয়ে ওঠে। যে কথাগুলি সে শুনেও শোনেনি, মানে যার বুঝেও বোঝেনি—চকিতে সেসব এখন স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে যায়। বিদ্যুত ঝলকের মত মনে পড়ে সমস্ত ঘটনাটা: স্বামীর সেই অনর্গল প্রশ্ন! আর, প্রেমিকার সেই অপার বিস্ময়! কেটে যায় কুয়াশার মেঘ, সবকিছু এখন জলের মত স্বচ্ছ—সে ধরা পড়ে গিয়েছে—সব জানাজানি হয়ে গেছে।

স-ব!

লজ্জায়, গ্লানিতে আইরিন অভিভূত হয়ে পড়ে, দেহ মন তার রী রী করে ওঠে ঘৃণায়। কেন—কেন তার ঘুম ভাঙল! কেন সে ফের জেগে উঠল!

হঠাৎ, নার্সারী থেকে ভেসে এল খোকাখুকুর কণ্ঠস্বর। এইমাত্র ঘুম ভাঙল ভাই বোনের। কলস্বরে কথা কইছে। পাখির কাকলি যেন।

নতুন প্রভাতকে অভিবাদন জানাচ্ছে ভোরের পাখিরা যেন!

ওই তো রুডির গলা। হুবহু স্বামীর কণ্ঠস্বর! আশ্চর্য! বাপের সাথে ছেলের কণ্ঠস্বরে এত মিল—অথচ কোনদিন এটা কিনা তার খেয়াল হয়নি! আশ্চর্য!

মৃদু হাসিতে আইরিনের ঠোঁট দুটি ঈষৎ স্ফুরিত হয়ে ওঠে। আবেশে চোখ বুজে আসে, চোখ বুজে সে উপভোগ করতে চায় মনোরম এই পরিবেশটুকু—যার জন্যে বাঁচা তার সার্থক হয়েছে, যার জন্যে খুশিতে হৃদয় এখন কানায় কানায় ভরে গিয়েছে।

এখনো একটা ব্যথা খচখচ করছে অন্তরের অন্তস্থলে—করুক, এ-ক্ষত নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। ধীরে ধীরে এটা নিরাময় হয়ে যাবে—আইরিন জানে—দুদিনেই সে একেবারে সুস্থ হয়ে উঠবে।